

পঞ্চশর

পঞ্চশর

প ঞ্চ শ র

পঞ্চশর

পঞ্চশর



প্রেমেন্দ্র মিত্র

★

পঞ্চশর

পঞ্চশর

পঞ্চশর

পঞ্চশর

পঞ্চশর

★



সিগনেট প্রেস। কলকাতা ২০

সুবাসিকেষু

দ্বিতীয় সিগনেট সংস্করণ

ভাদ্র ১৩৬২

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০।২ এলগিন রোড

কলকাতা ২০

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

মুদ্রক

প্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ

৫ চিন্তামণি দাস লেন

প্রচ্ছদপট মুদ্রক

গসেন এন্ড কোম্পানি

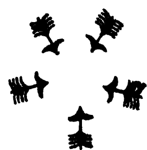
৭।১ গ্রান্ট লেন

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইন্ডিং ওয়ার্কস্

৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রিট

দাম দুটাকা চারআনা





পথ যেন আর ফুরোতে চায় না।

সুরমা এর মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। গরুর গাড়ি পেছনেই আসছিল, আমি বললাম, "আর না হয় হেঁটে গিয়ে কাজ নেই, এবার গরুর গাড়িতে ওঠা যাক।"

সুধীরবাবু সকলের চেয়ে এগিয়ে এগিয়ে চলছিলেন; শুনতে পেয়ে বললেন, "না, না, তা হয় না। যাওয়ার আনন্দই মাটি হবে তাহলে।"

সুরেন আর শ্রীপতিও আপত্তি করতে যাচ্ছিল। সুরমাকে দেখিয়ে ইশারা করাতে আপত্তিটা চেপে গিয়ে বললে, "তাই হোক।" কিন্তু কোথায় গরুর গাড়ি! পেছনে যতদূর দেখা যায় কোথাও তার চিহ্নও নেই। বেরুবার সময় গাড়োয়ান একবার বিনীতভাবে জানিয়েছিল যে পথ অনেক, বাঙালীবাবুরা অতটা হাঁটতে পারবেন না। কিন্তু আগ্রহ উদ্যম তখন আমাদের অত্যন্ত বেশি। সকলের ধমক খেয়ে বেচারী একেবারে ভড়কে গিয়েছিল এবং এখন বোধহয় বাবুদের শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত

হয়েই জিনিসপত্র বোঝাই নিয়ে স্বভাবসিদ্ধ মন্থর গতি বাড়াবার কোনো চেষ্টাই করেনি।

আটজনে আজ সকালে খেয়ালের মাথায় বেরিয়ে পড়েছি। সুরমাকে বারণ করেছিলাম। কিন্তু শেষে তার আগ্রহ দেখে আর নিষেধ করতে পারিনি।

আগ্রহ সব চেয়ে নীরদবাবুরই বেশি। এ অভিযানের তিনিই প্রধান উদ্যোগী। তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি তিনি এরই মধ্যে দশম শতাব্দীর কোনো অপূর্ব শিলালিপি আবিষ্কার করে বাঙলার প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাস বদলে দিয়েছেন।

আমাদের লোভ অবশ্য শুধু পথটির ওপর ছিল। লোভ করবার মতো পথই বটে। শাল মহুয়া বনের ভেতর দিয়ে ছোট ছোট পাহাড়ের কিনার দিয়ে, শীর্ণ বালুনদীগুলি পার হয়ে পথটি কেবলই যেন প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায়। কিন্তু বেরিয়ে পড়বার সময় নিজেদের শক্তি সামর্থ্য কতদূর সেইটুকু শুধু যাচাই করা হয়নি।

কদিন ধরেই প্রভুয়া আমাদের কৌতূহল উস্কে দিচ্ছিল। তার উচ্ছ্বসিত বর্ণনার বারো আনা বাদ দিয়েও আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। এই বুনো দেশে অপরূপ কোনো অবজ্ঞাত অজ্ঞাত প্রাচীন যুগের কীর্তি আবিষ্কারের আশায় নীরদবাবুর কল্পনা তো আর রাশ মানতেই চাইছিল না।

প্রভুয়া বলেছিল দূরের পাহাড়ের ধারে এক জায়গায় অপূর্ব কতগুলি মন্দির, প্রাসাদ ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ আছে। এ দেশের লোক ভূতের ভয়ে নাকি সেদিক মাড়ায় না। সব চেয়ে আশ্চর্য নাকি সেখানকার এক অটুট দেবমূর্তি। এ দেশের লোকের কল্পনায় সে মূর্তি নানা অলৌকিক কাহিনীর কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সেই খোঁজেই যানবাহন নিয়ে বেরিয়ে পড়া গিয়েছিল।

বিদেশে বিভুঁয়ে যে কজন বাঙালী একত্র হয়েছিলাম সবাই প্রত্নতত্ত্বের

আকর্ষণে না হোক, পথের আনন্দের আশায় দলে যোগ দিয়েছিলাম। শুধু এখন মনে হচ্ছিল সুরমাকে আনা বোধহয় উচিত হয়নি। সুরমা নিজে কিছুতেই ক্লান্তি স্বীকার করে হার মানবে না জানি, তাই নিজেই বললাম, গরুর গাড়ি না এসে পৌঁছানো পর্যন্ত কিছুক্ষণ না হয় কোথাও বিশ্রাম করা যাক।

প্রকান্ড বট গাছটির ছায়ায় বসে পড়া গেল। অনন্তবাবু এতক্ষণ কথা কইবার ভালো সুযোগ না পেয়ে বোধহয় হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, বললেন, "আপনারা মাপ করবেন, আমি একটি গল্প বলব।"

বিনয় বললে, "কিসের?"

অনন্তবাবু অপূর্ব ভঙ্গিতে হস্ত সঞ্চালন করে বললেন, "এখানে একমাত্র যে গল্প বলা যায়—প্রেমের। না, হাসবেন না, এ দেশের ধরনই আলাদা। অন্য দেশের মাটি যেন গৃহস্থের ঘরণী—শস্য ফলায়, শান্ত শিষ্ট বধূটির মতো সহজ অনাড়ম্বরভাবে প্রতি দিনের কাজ করে যায়। আর এ দেশের মাটিতে শস্য ফলে না, বন্ধ্যা রাঙা মাটি, নিরর্থক নীল পাহাড়। অন্য দেশের মাটির যেন বয়স হয়েছে, তারা চপলতা ছেড়ে ঘরকন্নায় মন দিয়েছে, আর এ দেশের মাটির কৈশোরের নেশা, চঞ্চলতা যেন কাটেনি। কিন্তু সে কথা যাক। যে কাহিনী আজ বলতে যাচ্ছি, সেটি পুরাতন, কিন্তু এতদিন বাদে তা বলবার সুযোগ আজ এসেছে।"

অনন্ত বসুর কাহিনী—কাহিনীর মতো করেই দিলাম।

এইরকম এক সন্ধ্যায় মনে হয় যেন কালের গতি থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, যেন শুধু আমি আছি, আমার সন্ধ্যা আছে, আর আছে মানসলোকের চিত্রপটে একরঙা জীবনের ছবি—শুধু স্থির ছবি। সে ছবির তলায় যেন কোনোদিন জীবনের বুক ধুকধুক করেনি, তার

পেছনে পরিণতির বেগ ও উদ্বেগ যেন ছিল না। যারা এসেছে আর চলে গেছে তারা যেন হৃদয়ের শোণিতে তাদের চোখের জল মেশায়নি, যেন আনন্দের বেগ দেয়নি বুকের স্পন্দনে, শিরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিকড় জড়িয়ে যাবার সময় গভীর চিরস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করে যায়নি। শুধু মনে হয় তারা এসেছিল, তারা চলে গেছে। এই ধূম্রবরণ সন্ধ্যার অনতিগাঢ় অন্ধকারে যেন চেতনার গতির অনুভূতিটি নষ্ট হয়ে যায়। অন্তরের স্বচ্ছ গভীরতায় শুধু দেখি—অতীতের স্মৃতি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, রক্তের দাগ যেখানে লেগেছিল সেখানে সমস্ত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, যা কিছু উত্তপ্ত ছিল শীতল হয়ে গেছে, যা কিছু ব্যথায় অস্থির ছিল শান্ত হয়ে গেছে। মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন এই সন্ধ্যার অন্ধকার প্রবেশ করে সমস্ত ভার লঘু করে দিয়েছে।

আজ অনেক কথা নির্বিকার চিত্তে বলতে পারি বোধহয়। সে কথাকে হয়তো অন্য সময় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করবার বেদনা সহ্য করতে পারতাম না কিম্বা চাইতাম না।

শেষের দিন তাকে বলে এসেছিলাম, "তোমার বুকের একটি কোণে একটি চিরন্তন বেদনার কাঁটা হয়ে রইলাম এই আমার সান্ত্বনা।" বলেছিলাম কিন্তু নিজে বিশ্বাস করিনি। সেও হেসেছিল।

আজ দশ বছর বাদে বিগতযৌবনা একটি মেয়ের কাছ থেকে চিঠি এসেছে—"এতদিন নিজেকে ভুল সান্ত্বনা দিয়েছ, তোমার সান্ত্বনা অসার মিথ্যা; হৃদয়ের কোনোখানে একটি আঁচড়ও তুমি রেখে যেতে পারনি—তোমার অসহ্য দর্প এখনো হয়তো ওই সান্ত্বনা আশ্রয় করে খাড়া হয়ে আছে ভেবেই এতদিন বাদে এইটুকু লিখলুম।"

মনে মনে বললাম, হায় সে দিনের দর্পিতা! তোমার নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে পেরেছিলাম, কিন্তু তোমার দীনবৃত্তি দেখে যে কান্না পায়! এতদিন বাদে সান্ত্বনা ভাঙতে আসার ছলে এই করুণ কাতরতা দেখানো কি তোমার শোভা পায়! এই সামান্য ছলটুকুর আড়ালে অমন করে

এতদিন বাদে ভিক্ষা করতে আসতে তোমার সঙ্কোচ হল না? লজ্জা হল না? তোমার আঘাত ভুলে গেছি কিন্তু তোমার অহঙ্কারকে এখনো শ্রদ্ধা করতাম, সে শ্রদ্ধাটুকুও হারালে। হতভাগিনী! তোমার এই অধঃপতনে কান্না আসে।

তাকে কোনো উত্তর দিইনি।

সত্য উত্তর দিতে হলে লিখতে হত, "হায় সুন্দরী, নিজেকে সান্ত্বনা দেবার সময় পাইনি; নব নব হৃদয়ের দেশে নানা অভিযানে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। আজ তুমি যখন এত অনাবশ্যক আগ্রহ সহকারে বিস্মৃত সান্ত্বনার ভিত্তি ভাঙতে এসেছ, তখন না হয় সে সান্ত্বনা একবার স্মরণ করতে পারি অনুশোচনারূপে।"

কিন্তু আজ আর তা লেখা সম্ভব নয়। যে তার দর্পটুকুও হারিয়ে এমন দীনা কাঙালিনীর বেশে এল, তাকে আঘাত করবার মতো নিষ্ঠুরতা, সমস্ত অতীত অপমান লাঞ্ছনা আঘাত বেদনার জ্বালা নতুন করে জ্বালিয়ে তুলতে পারলেও, আমার মনে জাগাতে পারব না। তার চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেছি। তার ঠিকানা দেওয়া ছিল, না পড়ে পুড়িয়ে ফেলে দিলাম। কোনো দুর্বলতার মুহূর্তে সে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতু নির্মাণের হাস্যকর চেষ্টা করবার লোভ হলেও উপায় যেন না থাকে। আমার অন্তরের একটি যৌবনক্ষতের মাঝে যে দর্পিতার শূন্য বেদী আছে তাকে অপমান করতে পারবে না।

ছেলেবেলা খেলা করতে করতে ঝগড়া করলে মা বলতেন, "ছি, ঝগড়া করতে নেই, তোমার সঙ্গে যে চিত্রার বিয়ে দেব।"

মা'র পিঠের ওপর খোঁপা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলতাম, "মাগো, ওই পেত্নীটাকে—"

চিত্রা বোকার মতো বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকত।

মা বলতেন, "আহা, অমন টুকটুকে মেয়েটি! যাও তো মা, চিত্রা, ভালো করে চুল বেঁধে কাপড় পরে এস তো, নইলে তোমার বরের পছন্দ হবে না।"

চিত্রা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে কান্নাকাটি করে একটা রঙিন কাপড় গায়ে জড়িয়ে এসে বলত, "মাসিমা, এসেছি।"

ছেলেমানুষ হলেও চিত্রার বোকামিতে হাসবার মতো বুদ্ধি তখন আমার হয়েছিল। আমি খিলখিল করে হাসতাম। কিন্তু স্নেহের হাসি চাপতে চাপতে বিমুঢ় চিত্রাকে কাছে টেনে মা বলতেন, "বা, দিব্যি বৌটি!" চিত্রা ফিক করে একটু আনন্দের হাসি হাসত।

কিন্তু একদিন হঠাৎ সে এমন করে সেজে আসতে অস্বীকার করেছিল মনে আছে। হাসি মুখ গম্ভীর করে বলেছিল, "আমি তো তোমাদের কেউ হব না।"

মা বলেছিলেন, "কেন রে পাগলি?"

সে বলেছিল, "তোমরা বড়লোক, আমরা গরীব, তোমাদের কত টাকা, আমরা তো তোমাদের ভাড়াটে। তোমাদের বৌ হব না।"

মা হেসে তাকে কোলের মধ্যে টেনে বলেছিলেন, "কে বললে তোরা গরীব?—না, তুমি আমাদের বৌ হবে, কেমন?"

সে জোর করে মা'র হাত ছাড়িয়ে মুখ ভার করে চলে যেতে যেতে বলেছিল, "না, ও কেন আমাকে পেত্নী বলে, আমার কথায় হাসে, আমি ওকে কিছুতেই বিয়ে করব না।"

তখন চিত্রার বয়স সাত হবে।

আমি খুব হেসেছিলাম কিন্তু একটু বোধহয় বিস্মিত হয়েছিলাম সেই বয়সেই।

শৈশব কৈশোর পার হয়ে তারপর একদিন দারুণ গ্রীষ্মের তপ্ত কর্মহীন দুপুরে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলাম যে, আমার বাড়ির এক পা দূরেই একটি পুরাতন অতি পরিচিত একতলা বাড়ির প্রতি ইটখানি অসীম

রহস্যে পরিপূর্ণ, তার প্রতি দ্বার ও প্রতি বাতায়নে অসীম রহস্যের অস্পষ্ট হাতছানি। সেটি আমাদেরই ভাড়াটে বাড়ি। তার অন্তরের মায়া-প্রকোষ্ঠে একটি অতি পরিচিত বালিকাকে চিনতাম। আজ সেখানে যে দুর্জ্ঞেয় নবযৌবনা থাকে তাকে চিনিনে—কিন্তু তার জন্যে কৌতূহলের আর অন্ত নেই।

উত্তপ্ত বৈশাখ দুপুরের শিথিল স্তব্ধতার মাঝে সময়ে সময়ে একটি ছোট খেয়ালি ঘূর্ণিবায়ু হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। এখানকার শুকনো খড়কুটো পাতা ওখানে নেড়ে রাখে, একটি পর্দা ঈষৎ সরিয়ে কৌতুক ভরে ক্ষণিকের জন্যে উঁকি দিয়ে যায় ও একটি দ্বারে অকারণে একটু মৃদু আঘাত করে সরে যায়। এমনি একটি খেয়ালি বাতাস সেদিন বৈশাখের অলস দুপুরে সামনের বাড়ির একটি পর্দা ঈষৎ সরিয়ে ক্ষণিকের জন্যে একটি গৃহকর্মরতা নবযৌবনাকে এমন করে আমায় দেখিয়েছিল যেমন করে তাকে কোনোদিন অতি নিকটে বহুক্ষণের জন্যে পেয়েও দেখিনি। অনেক অদৃশ্য পর্দা সেদিন হাওয়ায় দুলে উঠেছিল, অনেক গোপন দ্বারে মৃদু আঘাত লেগেছিল এবং সে বাতাসের খাম-খেয়ালিতে অনেক কিছু অলক্ষিতে স্থানচ্যুত হয়েছিল।

মাস পাঁচেক পরে বিকেলবেলা মাসিমার সঙ্গে তাঁদের দাওয়ায় বসে গল্প করছিলাম। বলছিলাম, "আপনাদের উত্তরের ঘরটার পেছনে অতখানি জায়গা মিছিমিছি পড়ে আছে। ভাবছি ওখানে একটা ঘর তোলবার বন্দোবস্ত করব, আপনাদেরও তো এই ঘরটায় ভাঁড়ার আর শোবার ব্যবস্থা এক সঙ্গে করতে বেশ অসুবিধা হয়।"

মাসিমা বললেন, "তা তো হয়ই বাবা, কিন্তু উপায় কি? আমরা তো আর বেশি ভাড়া দিতে পারব না, ঘর তৈরি করতে বলি কোন মুখে?"

চিত্রা তার ঘর থেকে ডেকে বললে, "একটা কথা শুনে যেও তো।"

কয়েক মাস ধরে মাসিমার সঙ্গে বিকেলবেলা আলাপটা বিশেষ রুচিকর অনুভব করতে আরম্ভ করেছিলাম। মাসিমাও বিশেষ খুশি হতেন দেখতাম এবং প্রায়ই আমাকে শুনিয়ে দিতেন যে বড়লোকের ছেলে হয়েও এমন অমায়িক ও নিরহঙ্কার তিনি কখনো দেখেননি। চিত্রা মাঝে মাঝে সে আলাপে যোগ দিত। কোনো কোনো দিন মা এলে তাশ খেলাও চলত। তখন চিত্রার ডাক পড়ত। চিত্রা কোনো দিন অসম্মতি জ্ঞাপন করলে আমি খুশি হতাম। দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো তার চারিধারে যে প্রচ্ছন্ন অটুট ব্যবধান আমার সমস্ত অগ্রসর হবার প্রয়াস ব্যর্থ করে দিচ্ছিল, সে ব্যবধান ভেদ করার মতো একটি দুর্বলতার ছিদ্র তা হলে পেতাম। চিত্রা মাত্র দু'একবার একটু মৃদু হাসা ছাড়া কোনোদিন বিশেষ কিছু বলেছে বলে আজ মনে পড়ে না। আমার শৈশবের খেলার সাথী, প্রগলভা চিত্রা কেমন করে এই চিরমৌন আত্মস্থ নবযৌবনার মাঝে এমন রূপান্তরিত হল ভেবে আমি আশ্চর্য হতাম। আর রাগ হত একটি লোকের ওপর। সে শুনতাম চিত্রার দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ভাই। মাঝে মাঝে এসে আমাদের খেলায় যোগ দিত। তারও চারিধারে অমনি দুর্ভেদ্য মৌনতার প্রাকার। খেলার মাঝে সমস্ত সশব্দ উচ্ছ্বাস, উল্লাস ও আক্ষেপ আমার ও মাসিমার দিক থেকেই হত। এক একদিন তার নীরব গাম্ভীর্য অসহ্য মনে হত, মনে হত চিত্রার এই নির্লজ্জ অনুকরণ করে সে শুধু আমার উচ্ছ্বাসের আতিশয্যকে ব্যঙ্গ করতে চায়, ইচ্ছা হত তার মাথাটা সবলে ঝাঁকি দিয়ে জিগগেস করি, আপনি কি বোবা?

উৎসুক হয়ে চিত্রার ডাকে উঠে গেলাম। চিত্রা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে একটা কলম নিয়ে অকারণে নাড়াচাড়া করছিল। আমি ঘরে ঢোকবামাত্র মুখ না ফিরিয়েই জিগগেস করলে, "আমায় চল্লিশটা টাকা দিতে পার?"

বিস্মিত হয়ে কাছে সরে বললাম, "পারব না কেন? এখনই চাই?"

সে বললে, "হ্যাঁ, পকেটেই আছে নাকি?" কথাগুলোর ভেতর বোধহয় ক্ষীণ বিদ্রূপের সুর ছিল, কিন্তু বিপুল বিস্ময়ে আমার বোধশক্তি বোধহয় ছিল না।

"না, এখুনি এনে দিচ্ছি।"—বলে আমি বেরিয়ে গেলাম।

চল্লিশটা টাকা এনে যখন তার ঘরে ঢুকলাম, তখনো চিত্রা এক ভাবেই টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে পেপার-ওয়েটটা অন্যমনস্কভাবে টেবিলের ওপর আঘাত করছিল।

টেবিলের ওপর টাকাগুলো রেখে স্বরকে যথাসাধ্য সহজ করবার চেষ্টা করে বললাম, "এখনই এত টাকা দিয়ে কি হবে চিত্রা?"

হঠাৎ আমার মুখে অগ্নিদৃষ্টি ফেলে তীক্ষ্ন বিদ্রূপের স্বরে চিত্রা বললে, "এত বেশি টাকা হল কি? গরু ঘোড়ারও তো দাম এর চেয়ে বেশি।"

তারপর একটু থেমে বললে, "ও, তুমি তো আরো অনেক ঘুষ দিয়েছ বটে! বাবাকে ঘোড়দৌড়ের জন্যে ধার দিয়েছ, দু'মাসের ভাড়া নিজের পকেট থেকে বাড়িতে দিয়েছ, মাসের বাজার করে দিয়ে টাকা নিতে ভুলে গেছ—আজকাল তোমার বিশেষ অনুগ্রহ এ বাড়ির ওপর, তুমি বড়লোক, তুমি অমায়িক, তুমি মুক্তহস্ত! তোমার টাকা তোমার অমায়িকতায় মা ভুলে গেছেন, তুমি অসন্তুষ্ট হও বলে জিতেনদার এ বাড়িতে আসা নিষেধ হয়ে গেছে। তার তোমার মতো টাকা নেই, তোমার মতো রূপ নেই, তার বাপ তার জন্যে লাখ টাকার সম্পত্তি উইল করে যাবেন না!"

আমি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চিত্রা আবার আরম্ভ করলে, "তা এখন হিসেব করে দেখ চল্লিশ টাকা কি বেশি হবে, যা দিয়েছ তার ওপর? আটঘাট বেঁধে চার ফেলতে কিছু গিয়েই থাকে অমন, এই

শেষ চল্লিশ টাকা দিয়ে নারীর ভালোবাসা কিনে নিতে পারলে বিশেষ লোকসান হবে কি তোমার? ভালোবাসা কেনার জন্যে নানা রকম ঘুষ দেবার ফন্দি খুঁজে হয়রান হচ্ছিলে দেখে নিজেই টাকাগুলো একেবারে চেয়ে তোমার কি সুবিধা করে দিলাম না?"

জীবনে এরকম বিস্মিত, স্তম্ভিত ও আহত আর কখনো হইনি বোধ-হয়। চিত্রার দীর্ঘ কৃশ দেহ কল্পিত অপমানের বিরুদ্ধে ক্রোধের উত্তেজনায় কাঁপছিল।

সেদিন ইচ্ছা করলে অনেক কথা বলতে পারতাম। বলতে পারতাম, তোমার ভালোবাসা যদি কেনার জিনিস হত আমি দুঃখিত হতাম না, চিত্রা! তোমার ভালোবাসা পাবার সামান্য আশাও তবু তাহলে আমার থাকত। আমার হীনতাকে, আমার নির্বুদ্ধিতাকে তুমি যত পার ভর্ৎসনা কর, চিত্রা, আমার স্পর্ধাকে যত পার বিদ্রূপের কশাঘাত কর, কিন্তু তোমায় আমি ভালোবেসেছি, এই কথাটি অবিশ্বাস কোরো না। তোমার সমস্ত অমূলক অপবাদের মধ্যে এইটুকুই সত্যি যে আমি তোমার ভালোবাসা চাই। সে কি এত অন্যায়, চিত্রা? ভাগ্যক্রমে আমার বাপ ধনী, সেটা কি আমার একটা অপরাধ, চিত্রা? ভাগ্যক্রমে হয়তো আমি অপ্রিয়দর্শন নই, তার জন্যে আমি কি ভালোবাসার অধিকার থেকে বঞ্চিত হব? হয়তো সেদিন নিজের অন্তরের বিপুল আকুলতার পরিচয় দিয়ে এই অপরূপ চিরমৌন মেয়েটির দুর্ভেদ্য অন্তরের কয়েক মুহূর্তের এই উত্তেজিত অসাবধানতার অবসরেই প্রবেশাধিকার পেতে পারতাম। কিন্তু তখন শিরায় শিরায় আদিম প্রপিতামহের রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। আঘাতের বদলে প্রতিঘাত দিতে হবে। অপমানের প্রতি-শোধ চাই।

শুষ্ক কঠিন ব্যঙ্গস্বরে বললাম, "তুমি বুদ্ধিমতী চিত্রা, আমার মতলবটা বুঝতে তোমার দেরি হয়নি। কিন্তু একটু ভুল করেছ তোমার অহংকারের দরুন; তোমার ভালোবাসা কেনার জন্যে মূল্য দিচ্ছি মনে

করে নিজেকে অযথা একটু সম্মান দিয়েছ। ভালোবাসা কেনা যায় না সে আমিও জানি, তুমিও জানো। যার জন্যে দাম দেওয়া যায়, তারই জন্যে দিয়েছি। তোমার ভালোবাসার জন্যে এক কানাকড়ি দেওয়াও আমি অপব্যয় মনে করি।"

চিত্রা চিৎকার করে বললে, "কি বললে?"

যথাসাধ্য স্বর সহজ ও কঠিন করে বললাম, "অত আহত বিস্ময়ের ভান দেখিও না, চিত্রা, তাতে দর বিশেষ বাড়বে না, বরঞ্চ এমন সুযোগটা হাতছাড়া—"

আমার কথা শেষ করতে পারিনি। চিত্রা উন্মত্তের মতো চিৎকার করে সীসের পেপার-ওয়েটটা তুলে নিয়ে সবলে আমার দিকে নিক্ষেপ করলে। আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও অস্ফুট চিৎকার করে বসে পড়লাম। ডান চোখের ওপরে বিপুল বেগে পেপার-ওয়েটটা লেগেছিল! ফিনকি দিয়ে রক্তের ধারা ছুটছিল, চোখের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। চশমার কাঁচ ভেঙে চোখের ভেতর বিঁধে গিয়েছিল।

সে চোখের দৃষ্টি আর ফিরে পাইনি।

বিস্মিত আতঙ্কে মাসিমা ছুটে এলেন, বাড়ির আরও অনেকেই এল ভিড় করে। কিন্তু সব চেয়ে এই কথাটি মনে করে অবাক হই যে, সেদিন সেই আকস্মিক আঘাতের দারুণ যন্ত্রণার মাঝেও আমি একটি মর্মাহত মেয়ের নিদারুণ লজ্জাকর অসহায় অবস্থা ভেবেই অন্তরের মাঝে শিউরে উঠছিলাম! সেদিনকার সেই ঘরের কোণের অপমাণে আতঙ্কে বিস্ময়ে কম্পমান চিত্রার মুখের কাতরতা স্মরণ করে, আজও যেন কান্না আসে। সেদিন বিশ্বসংসারের ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে আমার সুস্পষ্ট ক্ষতচিহ্ন বিপুল হয়ে সেই অসহ্য অপমানে আত্মহারা অভিমানী মেয়েটির অন্তরের অদৃশ্য ক্ষতটি সম্পূর্ণ আড়াল করে দিলে। আমার কপালের রক্তে একটি দৃপ্তা কুমারী চিরদিনের মতো অকারণে কলঙ্কিত হয়ে গেল।

রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে শুনি আমাদের বিশ বছরের ভাড়াটেরা উঠে যাচ্ছে, তাদের এই পরিচিত প্রতিবেশীদের মাঝে মুখ দেখানো নাকি অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

মা একদিন বলে ফেললেন, "নিজেরা মানে মানে উঠে গেল, ভালোই করলে, না হলে আমাদেরই উঠতে বলতে হত।"

চুপ করে রইলাম। তাঁর একমাত্র পুত্রের একটি চক্ষুর বিনাশ, মা যে কোনো মতেই ক্ষমা করতে পারেন না! তারা কোথায় গেল জানবার কৌতূহল হলেও, জিগগেস করতে পারিনি সেদিন।

আশ্চর্যের কথা এই যে, সেদিনকার সেই ঘটনা নিয়ে কেউ আমাকে কোনো প্রশ্ন করারও প্রয়োজন মনে করেনি। এই ঘটনাটা যতই অসাধারণ ও ভয়ঙ্কর হোক না, তার হেতুটা নাকি এতই স্পষ্ট যে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু বহুদর্শী সংসারের সংস্কার-কঠিন অন্ধ মন, দুটি যুবক-যুবতী সংক্রান্ত এই উপাদেয় ঘটনার মীমাংসা অতি সহজে করে ফেললেও একটি ছোট বালিকার নির্বোধ মনে সে প্রশ্ন উঠেছিল। আমার ছোট বোন একদিন বিছানার পাশে বসে বাতাস করতে করতে হঠাৎ জিগগেস করে ফেললে, "দাদা, চিত্রাদি তোমায় মারলে কেন?"

কেন?—সেই কথাই তো ভাবছিলাম, এমন ঘটনাই ঘটল কেন, রোগ শয্যায় শুয়ে এতদিন ধরে তার কোনো সদুত্তর পাচ্ছিলাম না। চিত্রা আমার এতদিনের সমস্ত আচরণকে বিকৃত করে তার নারীত্বের মর্যাদার প্রতি অপমানের চেষ্টা বলে ভুল কবলে কেন? যেখানে কোনো বাধা ছিল না, সেখানে আমরা যুক্তিহীন কল্পনার প্রাচীর গড়ে এমন করে পরস্পরকে দূরে ঠেলে রাখলাম কেন?.

সেদিন ছোট বোনকে কি একটা উত্তর দিয়েছিলাম এবং পরদিন মাকে সাহস করে জিগগেস করেছিলাম, "মা, নবীনবাবুরা কি দেশে গেলেন?"



মা বিরক্ত মুখে বলেছিলেন, "জানি না বাছা, আমার কি পৃথিবী শুদ্ধ লোকের খোঁজ রাখা ছাড়া আর কাজ নেই?"

"পৃথিবী শুদ্ধ লোকের খোঁজ তো তোমায় রাখতে কেউ বলছে না মা, তোমার বাড়ির বিশ বছরের পুরোনো ভাড়াটে কোথায় উঠে গেল, সেইটুকুই শুধু জানতে চেয়েছিলাম।"

মা রেগে উঠে বললেন, "কোথায় উঠে গেল, তা আমি কোথা থেকে জানব! আমার বড় সুখের সময় কিনা, তাই আমি আহ্লাদ করে খুনেদের বাড়ি আলাপ করে আসব। পুলিশে দিইনি—এই তাদের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।"

"কাকে পুলিশে দিতে মা—"

"জানিনে বাছা, তোমাদের সঙ্গে কথায় পারবার যো নেই! পুলিশে দেবে না তো কি সন্দেশ খাওয়াবে আদর করে—এমন মানুষ খুন করা—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "যদি খুনেই বল মা, একটা মেয়ে কি শুধু শুধু হঠাৎ অমন খুনে হয়ে ওঠে—"

"তোমরা অনেক কথা বলতে শিখেছ বাপু আজকাল, কিন্তু ওসব বাহাদুরী কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। আমরা মুখ্যু সেকেলে মানুষ, ওসব বুঝি না। তোমাব চোখটি জন্মের মতো কানা করে দিলে, আর তুমি এসেছ তার হয়ে ওকালতি করে বাহাদুরী করতে! তাহলে বলি বাপু, তুমি এত বড় একটা বুড় মদ্দ, অত বড় ধাড়ী মেয়ের সঙ্গে কি কাজে রোজ রোজ আলাপ করতে যেতে?—যাই বল বাপু, তোমাদের আজকালকার ছেলেমেয়েদের অত বেহায়াপনা আমাদের জন্মে কখনো দেখিনি—"

মা রেগে আগুন হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মাকে আমি জানতাম। তবু তাঁর এই আকস্মিক আত্মপ্রকাশে সমস্ত মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

প্রায় একমাস হয়ে গেলেও ঘা শুকোতে চাইছিল না। মা ভীত হয়ে উঠেছিলেন। ডাক্তারেরা বোধহয় নালী ঘা'র আশঙ্কা করছিল। কদিন থেকে বেশ জ্বরও হচ্ছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় জানলার ধারে বসে, পরিত্যক্ত জনহীন ভাড়াটে বাড়িটির দিকে চেয়ে হঠাৎ কেমন নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করলাম। অসুস্থ শরীরে সময় সময় মন সামান্য কারণে অত্যন্ত উত্তেজিত ও অস্থির হয়ে ওঠে বোধহয়। এই জানলা থেকেই একদিন গ্রীষ্মের দুপুরে একটি বাতায়নের পর্দা সরে যেতে দেখেছিলাম! আজ সে বাতায়ন বন্ধ, পরিত্যক্ত বাড়িটির দ্বারগুলিতে তালা আঁটা! মনে হল সন্ধ্যার বিষণ্ন অন্ধকারে ওই বাড়িটির পরিত্যক্ত প্রতি কক্ষ থেকে নিঃসঙ্গ রাত্রির কল্পনায় নিঃশব্দ কাতর ভয়ার্ত দীর্ঘশ্বাস উঠছে নিজেকেও যেন অমনি ব্যর্থ, নিজের বুকও যেন অমনি শূন্য মনে হল মনে হল দূর আকাশের ধূসর চোখে যে বিদায়ের ম্লান চাহনি, সে শুধু যে দিনটি অবসান হল তার জন্যেই নয়, আমার জন্যেও।

নিজের জন্যেই নিজের চক্ষু সজল হয়ে এল, অনিচ্ছায়। এই দুর্বলতায় একটু লজ্জিত হলাম কিন্তু এ অশ্রু নিবারণ করতেও ইচ্ছা হল না নিজেকে বোঝালাম যে এ অশ্রু শুধু আমার জন্যে তো নয়, দরদর অশ্রুর পিপাসায় যত তৃষিত হৃদয় যুগে যুগে ব্যর্থ হৃদয়ে বিদায় নিয়েছে এ তাদের জন্যেও।

পরিত্যক্ত বাড়িটার মধ্যে একটা বিড়াল কি কারণে জানি না শ্রুতি-কটু একটা বিকট শব্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নিচে অমঙ্গল আশঙ্কায় মা সেটাকে তাড়া দিচ্ছিলেন শুনতে পাচ্ছিলাম। মায়ের অমঙ্গল আশঙ্কা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ নির্বোধ বিড়ালটা কিন্তু মায়ের আয়ত্তের বাইরে কোনো ঘরের ভেতর লুকিয়ে অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে স্বর সাধন শুরু করলে। মা বিরক্ত হয়ে বিড়ালটাকে অকারণ নিষ্ফল গালাগালি করে উপরে উঠে আসছেন শুনতে পেলাম।

মা [illegible] ভাবছিলাম, যুগযুগান্তরের কোটি কোটি বিরহীর পিপাসায় লে[illegible] মরু আমার এই কয়েক বিন্দু অশ্রুজলে কতটুকু সরস হবে? [illegible], সত্যি কি মূল্য আছে এই অশ্রুর? হোক সে দরদীর, হোক সে [illegible]প্রিয়ার! যে প্রিয়া ধরা দিতে সাহস করলে না, তার অগণন রাত্রির গোপন অশ্রুর চেয়ে ছলনাময়ী প্রিয়ার এক পলকের চুম্বন যে অনেক মূল্যবান! অসুস্থ মনে অনেক অসম্ভব কল্পনাকে অনাবশ্যক দীর্ঘ করতে পারি, কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে রক্তমাংসের শরীরী প্রিয়াকে বাহুর বন্ধনে নিষ্পেষণ করতে চাই, তৃষিত ওষ্ঠ দিয়ে প্রিয়ার হৃদয়ের সমস্ত সুবাস শোষণ করে নিতে চাই, তার পরম সুন্দর মুখখানি তুলে ধরে দুটি ব্যাকুল নয়নের দৃষ্টি দিয়ে তার নয়নের অতলে জীবনের চরম সার্থকতা অন্বেষণ করতে চাই—তাকে যে নিকটে চাই, নিকটতম করতে চাই। আজ যদি পৃথিবীর কাছে বিদায় নেবার সময়ই এল, তবে সজল চোখে ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে যাব কেন? চিত্রা ও আমার মাঝখানকার ব্যবধানের প্রাচীর যদি সত্যিই ভিত্তিহীন, তাহলে সে ব্যবধান অবজ্ঞা করার সময় কি আজও হয়নি? এই জীবনের বিদায় বেলায় কি ভুয়ো গোটাকতক কথার সম্মান রেখে অন্তরকে অপমান করে যাব?

মা ওপরে এলে হঠাৎ বললাম, "মা, মাসিমাদের একটা চিঠিতে আসতে লিখে দাও?"

মা বিস্মিত হয়ে বললেন, "তার মানে?"

"তার মানে শেষ পর্যন্ত আর নিজেকে ফাঁকি দিতে চাই না, মা।"

"আমি ওসব হেঁয়ালি কিছু বুঝতে পারি না বাপু, সোজা করে বলতে হয় তো বল।"

"সোজা করেই তো বলছি, মা। আমি নিজে লিখলে সুবিধা হবে না বলেই তোমায় মাসিমাকে একটা চিঠিতে চিত্রাকে সঙ্গে করে এখানে আসতে লিখতে অনুরোধ করছি।"

মা খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর মৃদু ধীর কণ্ঠে

বললেন, "তোর নিজের মায়ের সেবা কি তোর ভালো লাগছে না বাবা?"

সে স্বরে এত কাতরতা, আহত অভিমানের বেদনা ছিল যে আমি চমকে উঠলাম। মায়ের হাতটা নিয়ে আমার কপালে বুলিয়ে ক্ষুণ্ণস্বরে বললাম, "কেন তুমি ভুল বুঝছ মা, আমি কি এতই অকৃতজ্ঞ! কিন্তু যদি মরে যাই মা, তাই চিত্রাকে একবার বড় দেখতে ইচ্ছা করছে। আমার নির্লজ্জতা তুমি ক্ষমা কোরো।"

"ওসব অলক্ষুণে কথা কেন বলছিস বাবা? আমি তোর সব দোষ হবার আগেই ক্ষমা করে আছি, কিন্তু ভেবে অবাক হচ্ছি যার জন্যে তুই মরতে বসেছিস তাকেই দেখবার জন্যে এত পাগল হলি কেন। ও ছাড়া কি সংসারে আর ভালো সুন্দরী মেয়ে নেই?"

"মরতে বসেছি বলেই আজ আর লজ্জা করব না মা। ও অত কঠিন, অত সুন্দর বলেই আজকে আমার জগতে ও ছাড়া আর মেয়ে নেই। ও যদি সেদিন আমাকে অমন আঘাত না করত তাহলে হয়তো আজ ওকে দেখবার জন্যে এত ব্যাকুল হতাম না। আর আমি এটা ঠিক জানি মা, তুমি লিখলে তারা না এসে পারবে না, আমি জানি যে চিত্রা অনুতপ্ত না হয়েই পারে না। যদিও আমি তাকে সেদিন যে অপমান করেছিলাম তাব বদলে এই আঘাতটুকু না পেলে নারীর ওপর চির-কালের মতো অশ্রদ্ধা হয়ে যেত। আমি জানি মা, সে শুধু সঙ্কোচেই আসতে পারছে না, নিজের অহংকারকে বাঁচিয়ে আসবাব কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না বলেই সে আসতে পারছে না, তাকে সেই সুযোগটুকু দাও মা। সে যদি অপরাধও করে থাকে আমার জন্যে তাকে ক্ষমা কোরো।"

মা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, "তোকে অত করে বলতে হবে না বাবা, আমি তাদের কালই চিঠি লিখে দেব। তুই যদি এত সবের পরও তাকে দেখবার জন্যে পাগল হতে পারিস তো আমি মিছিমিছি

তোর সাধে কেন বাদী হব বাবা? আমার কি অসাধ যে তুই সুখী হস, তবে আমাদের কালে এসব আমরা জানতাম না—"

আমি সে কথা এড়িয়ে হেসে বললাম, "সামান্য একটা ভুলের ওপর একটা অতি করুণ ট্র্যাজেডি গড়ে উঠছে দেখতে গল্পে হয়তো বেশ ভালো লাগে, কিন্তু জীবনে কমিডিই সব চেয়ে বাঞ্ছনীয় মা, তার জন্যে যদি সমস্ত আচরণে উপন্যাসোচিত সঙ্গতির একটু অভাবও হয় তাও ভালো।"

"ওসব বড় বড় কথা বুঝি না বাপু, আমি চিত্রার মাকে কালই চিঠি লিখছি—আমার ছেলের একটি চোখ নষ্ট করবার অপরাধে আমি তোমার মেয়েকে লোহার নোয়া পরিয়ে চিরজনমের মতো আমাদের বাড়িতে বন্দী করতে চাই।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "এটা তুমি নিশ্চয়ই সম্প্রতি কোনো বটতলার ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে বলছ মা—"

দুজনেই হাসতে লাগলাম।

কিন্তু মাসিমারা এলেন না। আমিও অবশ্য সেরে উঠলাম। মায়ের মুখে কয়েকদিন ধরে একটা বেদনার ছায়া গাঢ় হয়ে উঠছিল। তার কারণ আমার অজ্ঞাত ছিল না। এই তাচ্ছিল্যের অপমান মা সহ্য করতে পারছিলেন না। কিন্তু নিজে যেচে যে অপমান ডেকে এনেছি, সে অপমান ফিরিয়ে দেবার কোনো উপায়ও ছিল না। প্রত্যেক দিন সকালে উঠে একটি ক্ষীণ আশা মনে জাগত—হয়তো ..

মনে হত তাও কি হতে পারে? চিত্রা অভিমানী, কিন্তু নির্মম সে তো নয়। আর মাসিমাকে কি আমি একেবারেই ভুল বুঝেছিলাম?

মা একদিন মুখ কালো করে ঘরে ঢুকে বললেন, "এই নাও অপমানের যেটুকু বাকি ছিল হয়ে গেল।"

মাসিমার চিঠি। মাসিমা আমাদের চিঠি সময় মতো পাননি। দেশ থেকে চিঠি অনেক ঘুরে তাঁদের আজকালকার ঠিকানায় পেঁাচেছে। তাঁদের এক বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, মেশোমশাই হঠাৎ ক'দিনের জ্বরে মারা গেছেন। তাঁরা এখন সহায়হীন। তাঁর একজন জ্ঞাতির দয়াতে তার বাড়িতে এই দূর বেহারের শহরটিতে আশ্রয় পেয়েছেন। মায়ের অনুরোধ রাখতে না পারার দরুন তিনি যে কি দুঃখিত তা বলতে পারেন না, কিন্তু তাঁর অবাধ্য দুরন্ত মেয়ের ওপর তাঁর কোনো হাত নেই। তিনি তাকে অনেক বুঝিয়েছেন, অনেক শাসন করেছেন, কিন্তু এরকম একগুঁয়ে মেয়ের কাছে সে সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে। এরকম ডাকিনী মেয়ের মা হবার জন্যে তাঁর লজ্জা ও অনুশোচনার আর অন্ত নেই। মেয়ের জ্বালায় তাঁর গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে। সে দিনের সেই ঘটনার পরও এই প্রস্তাব করে মা যে মহত্ত্ব ও তাঁদের প্রতি দয়া দেখিয়েছেন তার একটুও প্রতিদান না দিতে পেরে ও তাঁর বহুদিনের গোপন বাসনা শুধু এই মেয়েটির ধনুকভাঙা পণের দরুন পূর্ণ না হওয়ায় তিনি যে কি লজ্জিত ও দুঃখিত তা লিখে জানাতে পারলেন না; মা যেন তাঁকে ক্ষমা করেন।

মায়ের হাতে চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সে হাসির জ্বালায় যেন নিজের ঠোঁট দুটো পুড়ে গেল। কিছু-দিন আগেকার আসন্ন মৃত্যুর কল্পিত আশঙ্কা থেকে কেমন করে শেষে অমন অসম্ভব আশায় পেঁাছে মূর্খ নির্লজ্জের মতো হাসতে পেরে-ছিল্লাম মনে করে সমস্ত মনটা নিজের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে গেল।

হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম একদিন।

এবার দূর-মেয়ের নয়, দূর-দেশের টানে। উপভোগ করা যৌবনের স্বভাব, ব্যর্থতা বেদনা হতাশাকেও সে উপভোগ করতে পারে। যৌবনের

ধর্ম অহঙ্কার। ব্যর্থতা নিয়েও সে অহঙ্কার করে। ফুল যদি তার না ফোটে, ব্যর্থ মুকুলের ব্যথা নিয়ে সে হৈচৈ বাধিয়ে তুলতে পারে। যৌবনের জগতে নিত্য উৎসব, অহরহ সেখানে সমারোহ চলছে কোলাহলে। সে উৎসব ফাল্গুনের তোয়াক্কা রাখে না। আষাঢ়ের অশ্রুসিক্ত আকাশের তলেও সে মেতে ওঠে। তার সব সমারোহের পতাকা শুধু খুশির রঙেই রঙিন নয়, গাঢ় বেদনার রঙেও কতক তার ছোপানো।

সেদিন চিত্রার উপেক্ষাকে বৃথা যেতে দিইনি। সেদিন নিজের বুকের গভীর ক্ষতটির গর্বে সুন্দরী পৃথিবীকে নতুন করে সম্ভাষণ করেছিলাম। বলেছিলাম, হে হতভাগিনী, আজ আমার ললাটে তোমার শ্রেষ্ঠ সম্মানের টিকা পরিয়ে দিলে! তোমার গোপন অন্তর্লোকে যে ব্যর্থ বিরহীদের চিরন্তন সভা, সেখানে আজ আমায় বরণ করে নিলে—সেখানে শুধু নির্বাপিত দীপের দেয়ালী, সেখানে বিদীর্ণ বাঁশরির সুর, সেখানে অস্ফুট মুকুলের আর ছিন্ন কুসুমের মালা।

সেদিন সেই গভীর বেদনার প্রেরণায় জীবনকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছিলাম নিজের কাছে। সেদিন নিজেকে বলেছিলাম, এই মৃত্যুসাগর ঘেরা আয়ুর দ্বীপে বেদনার মুক্তা সংগ্রহ করে ফেরাতেই জীবনের চরম সার্থকতা। জীবন-দেবতাকে এই মৃন্ময় পাত্রে অশ্রুর অর্ঘ্য নিবেদন করতে হবে দিনের পর দিন।

পথে পথে অনেকদিন মুশাফির হয়ে বেড়ালাম। অনেক অচেনা পথের সুন্দরীকে বন্দনা করলাম আর মনে মনে বললাম, "তোমার ভেতর দিয়ে কোথায় আমার পূজা পৌঁছে দিতে চাই, বুঝলে কি নারী?"

কেউ বোঝেনি।

একজনকে বলেছিলাম, "তোমার চোখ দুটি ঠিক চিত্রার মতো।" সে বুঝতে পারেনি, কিন্তু এ একটা নতুন চাটুবাক্য মনে করে হেসেছিল। রূঢ়ভাবে তাকে হাসতে মানা করেছিলাম। সেদিন আমি চিত্রাকে অপমান করিনি।

কিন্তু একদিন একটা সামান্য স্টেশনে হঠাৎ একটা শাখা-লাইনের টিকিট করে গাড়িতে বসে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমার মনের কোণেও এমন কোনো ইচ্ছা ছিল বলে আমার জানা ছিল না।

বেহারের একটা নোংরা ঘিঞ্জি দুর্গন্ধ শহরের মাঝে উঠে বহুদিনের পুরোনো একটা চিঠি থেকে গাড়োয়ানকে যাবার ঠিকানা বাতলে দিলাম।

এমন করে হঠাৎ তার সামনে উপস্থিত হবার সংকল্প নিয়ে মন অনেক প্রশ্নই করতে চাইছিল, কিন্তু জোর করে তাকে বিরত করেছিলাম।

ময়লা ইজের-পরা বেহারী মেয়েটি একটি ওড়নায় তার যৌবনের প্রথম আভাসটি অসম্পূর্ণভাবে আবৃত করে দরজাটি ঈষৎ ফাঁক করে গাড়ির দিকে চেয়ে কাকে ডাকছে, "এ মনুয়া, মনুয়া রে—"

গাড়ি থেকে মুখ বার করে আমার ভালো-লাগাটি গোপন করবার কোনো চেষ্টা না করে যতদূর পর্যন্ত পারা যায় তার দিকে চেয়ে আছি। খোলার চাল দেওয়া মাটির ঘরের দেয়ালটিতে কোনো গ্রাম্য শিল্পীর হাতের নানা চিত্রের কারুকাজ দেখছি। মেয়েটি আমার নির্লজ্জতায় একটু ভ্রূকুটি করে আমার দিকে চেয়ে আছে দেখে আমি একটু হাসলাম। সে চক্ষে কৌতুক ও মুখে বিরক্তি এনে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। গাড়ি থেকেও আর দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এখনো গাড়োয়ানকে বলে গাড়ি ফেরাবার সময় আছে। নিজের মধ্যে একবার তলিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে—কিসের প্রত্যাশায় আজ এমন অকস্মাৎ সেখানে চলেছি? মনের কোন অতলতায় গোপন দুরাশা আজও কি মরেনি? যে ফিরে ফিরে আঘাত ও অপমান করলে এমন করে তার সামনে নির্লজ্জ ভিখারির মতো আবার যাচ্ছি কেমন করে! না, এ যাওয়া কোনো মতেই হতে পারে না। এখনো ফেরা যায়!

তবু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছি! গাড়ি এগিয়ে চলেছে। শহরের নোংরা

সরু বন্ধপ্রায় পথ ছেড়ে এবার অপেক্ষাকৃত ফাঁকায় এসে পড়েছি। ডান দিকে দুপুরের রৌদ্রে বহুদূরের একটা উঁচু ঢিপির ওপরে শাদা মন্দিরটি ঝলমল করছে। বাঁয়ে অপেক্ষাকৃত পয়সাওয়ালা চাষীদের বাড়ি। সামনে কিসের গোলমাল বেধেছে। পথে ভিড় হয়ে গেছে। গাড়ি ধীরে চলেছে। চার-পাঁচটা লোক একসঙ্গে তাল পাকিয়ে পথের ধারে একটা বাড়ির উঠানে এক পাশ থেকে আরেক পাশে ক্রমাগত গড়াগড়ি করছে এবং সমবেত পুরুষ ও নারীতে মিলে চিৎকার করছে! সমবেত লোকদের মুখে চোখে উপভোগের আনন্দ পরিস্ফুট হলেও ব্যাপারটা যে শুধু তামাশা নয়—এটা বুঝতে পারছি। কৌতূহলী গাড়োয়ান ব্যাপার কি জিগগেস করায় একজন উত্তেজিত দর্শক বহু উচ্ছ্বসিত গালাগালির সঙ্গে হাত-পা নেড়ে যা বললে তা থেকে এইটুকু শুধু জানতে পারলাম যে, সামনের ওই মানুষের তালটিতে দুটি ভাইয়ের ধ্বস্তাধ্বস্তি চলেছে, সঙ্গে দু'একজন সাহায্যকারী হিতৈষীও অবশ্য আছে। বড় ভাই কি কাজে বিদেশে যাবার সময় তার রক্ষিতা স্ত্রী-লোকটিকে ভাইয়ের জিম্মায় রেখে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে ছোট ভাইয়ের গচ্ছিত ধন ফিরিয়ে দেবার মতলব বিশেষ নেই এবং স্ত্রী-লোকটিরও যাবার বিশেষ ইচ্ছা নেই। তাই থেকে বচসা—শেষে এই ধ্বস্তাধ্বস্তি।

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই স্ত্রীলোকটি কোথায় জানতে চাইলে একজন দেখিয়ে দিলে সে ওই ঘরের ভেতর বসে আছে। গাড়ি থেকে অবশ্য এই সুন্দ-উপসুন্দের মনোহারিণীকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু ভাবলাম মন্দ কি! নারীকে জয় করবার এই প্রথা আদিম অরণ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। কেমন সহজ পন্থা! কি সুন্দর মীমাংসা করবার উপায়! আরও সভ্য হয়ে আমরা প্রেমকে আরও ওপরের স্তরে তুলে নিজেদের জটিল মনের কাছেই দুর্বোধ আঘাত প্রতিঘাতে হয়রান হয়ে বিশেষ কিছু জিতেছি কি?

মনের সব গতিবিধি কি নিজেই বুঝি?

গাড়ি থামল। গাড়োয়ান নেমে দরজা খুলে বললে, "ইয়ে মোকাম হ্যায় জনাব।"

এখানে পৌঁছেও কেমন করে তাদের সামনে গিয়ে উঠব ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু গাড়োয়ানের সামনে ইতস্তত করা চলে না। পুরোনো ভাঙা দেওয়ালে ঘেরা জমিতে বেল আর শিশুগাছের ফাঁকে একটি পুরোনো বাড়ির খানিকটা দেখা যাচ্ছে, কম্পিতবুকে গাড়োয়ানের হাতে মোট দিয়ে এগিয়ে চলেছি। সামনের ইঁদারায় কে একটি মেয়ে পিছন ফিরে জল তুলছে। শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠল। "এই যে চিত্রা বড় রোগা হয়ে গেছ তো! মাসিমা কই? এই লাইন দিয়ে দেশে ফিরছিলাম, ভাবলাম মাসিমাকে একবার দেখে আসি, মা অনেক করে বলে দিয়েছিলেন।"

মূঢ়ের মতো অকারণে নিজে নিজেই হাসছি। সামনে একটি কৃশতনু নারী নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে সে-ই জানে।

কিন্তু এ নিস্তব্ধতা অসহ্য। অথচ আর কি কথা বলা যেতে পাবে!

"তাহলে এই বাড়িতে আছ এখন? খুব গাছপালা আছে তো!"

এতক্ষণে চিত্রা মৃদুস্বরে বললে, "মা ভেতবে আছেন, চলো।"

"চলো।"

অতীতের একটি কলঙ্কিত দিনকে কি কোনো মতেই জীবন থেকে মুছে ফেলা যায় না? তা ছাড়া আজ সর্ব প্রথম চিত্রাব সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কি দেখা হতে পারত না!

মাসিমা আমাকে দেখে পরলোকগত স্বামীকে স্মরণ কবে খানিক কাঁদলেন। তারপব মনে পড়ল যে আমি ট্রেনে ক্লান্ত হযে এসেছি। চিৎকার করে বললেন, "কোথায় গেল সে হতভাগী মেযে?"

হতভাগী মেয়ে নিকটেই কোথায় ছিল বোধহয়! নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়াল।

"বলি, একটা লোক ট্রেনের ধকলে ক্লান্ত হয়ে এল, তাকে হাত মুখ ধোবার জল দেবার কথাও কি আমায় মনে করিয়ে দিতে হবে?"

মাসিমা আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বোধহয় আমার উপস্থিতি স্মরণ করে চুপ করে গেলেন। এই প্রবাসে অনূঢ়া কন্যা ও তার নিরুপায় মাতার দিন তাহলে এমনি করেই কাটছে বুঝলাম।

আমার এই হঠাৎ নির্বোধের মতো এখানে আসাটা শুধু অশোভনই হয়নি, অশুভও হয়েছে অনেক দিক থেকে। কিন্তু চিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল—মানুষের মুখ সেখানে নেই—মুখোশ! স্পন্দহীন, প্রাণহীন মুখোশ—তাতে আনন্দ বেদনা ক্রোধ বিরক্তির এতটুকু ছায়া পড়ে না।

সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল! আর আমি ভাবছিলাম এই পাথরের কঠিন মুখোশ বিভিন্ন করে এই সুন্দর মেয়েটির অশ্রুর উৎসে কিছুতেই কি ঘা দেওয়া যায় না?

মাসিমা অনেক কথাই জিগগেস করছিলেন। কিন্তু দুজনেই সাবধানে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম একটি দিনের কথাকে।

মাসিমা বলছিলেন, "এই বিদেশে কি সুখে আছি বাবা! তিনি তো পুণ্যাত্মা লোক, সকল দায় এড়িয়ে স্বর্গে চলে গেলেন—আর আমি হতভাগী পড়ে রইলাম! একটি পয়সা নেই, গলায় এত বড় একটা মেয়ে ঝুলছে, কি যে করব।"

পায়ের মৃদু শব্দ শোনা গেল।

মাসিমাকে বাধা দিয়ে বললাম, "ডান চোখটা কিন্তু জন্মের মতো নষ্ট হয়ে গেছে মাসিমা, কেটে বার করে ফেলে পাথরের চোখ বসিয়ে দিতে হল।"

পাথরের মুখোশ খসে গেল বটে। মাসিমা আতঙ্কে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু নিজের নির্লজ্জ ঘৃণিত নীচতায় সমস্ত মুখ আমার কালি হয়ে গেল।

ভাবছি কাল দুপুরের গাড়িতেই বিদায় নেব। এ পর্যন্ত যত ভুল করেছি তার মধ্যে এখানে আসাটা বোধহয় সব চেয়ে বড় ভুল! মাসিমা আমার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে কঠিন হয়ে উঠেছেন। চিত্রাকে দেখতেই পাইনি এ দুদিন। আমার ছোটখাট দরকারের তদারক করতে মাসিমা নিজেই আসেন। চিত্রাকে পাঠাবার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর মত বদলে গেছে।

আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর পায়চারি করছি অন্ধকারে। শিশু-গাছের পাতাগুলির অর্ধস্ফুট মর্মরের সঙ্গে কেমন করে যেন তারাদের কম্পিত দৃষ্টি মিশে অপরূপ করে তুলেছে রাত্রিকে। দশমীর চাঁদ সবে অস্ত গেছে।

চিত্রার প্রথম আঘাতের ব্যথার মধ্যে একটি উদ্ধত জ্বালা ছিল যা আমাকে দগ্ধ না করলেও উন্মত্ত করে রেখেছিল, কিন্তু এখনকার এই নীরব ঔদাসীন্য শুধু অসীম ক্লান্তিতে আর হতাশায় হৃদয় পূর্ণ করে তোলে। যৌবনের ব্যর্থতায় অহঙ্কার করবার মতো শক্তি আর যেন নেই।

বাগানের মাঝে কিসের যেন শব্দ উঠছিল। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরুলাম। কাছেই কোথা থেকে চাপা কান্নার শব্দ আসছিল। বিস্মিত হয়ে শব্দের দিকে একটু এগিয়ে গেলাম। বাঁধানো ইঁদারার পাশে মুখ নিচু করে কে প্রাণপণে যেন প্রবল কান্নার বেগ রোধ করবার চেষ্টায় ফুঁপিয়ে উঠছিল।

আরো কাছে সরে গিয়ে ডাকলাম, "চিত্রা!"

সে কোনো কথা কইল না। নীরবে আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে দুহাতে আমার পা জড়িয়ে ধরল। বুঝতে পারছিলাম আমার পা

দুটি উত্তপ্ত অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে যাচ্ছে, তার বিশৃঙ্খল চুল আমার চরণ বেষ্টন করে ছড়িয়ে পড়েছিল। পায়ে তার কোমল মুখের স্পর্শ অনুভব করছিলাম। কিন্তু পা নাড়তে পারলাম না—শক্তিই ছিল না। সমস্ত দেহ মন মৃত্যুর মতো নিবিড়, বিপুল আনন্দের অবসাদে শিথিল হয়ে আসে! ধীরে নত হয়ে তার মাথার ওপর একটি হাত রেখে মৃদু-স্বরে ডাকলাম, "চিত্রা!"

সহসা সে সবেগে আমার পা ছেড়ে উঠে চলে গেল।

পরদিন ভোর না হতেই সে ঘরে এল। রুক্ষ মুখ, চোখে জ্বালাময় দৃষ্টি। চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে সে কেন জানি না ইতস্তত করছিল। বললাম, "ঘরে এস।"

সে ভিতরে ঢুকে বললে, "তুমি আরও কত দিন থাকতে চাও জানতে এলাম।"

'আরও'-র ওপর জোর দেওয়াটা কেমন খারাপ শোনাল। তার মুখের দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে বললাম, "আরও কতদিন থাকলে তুমি খুশি হও চিত্রা?"

"তুমি থাকলে আমি খুশি হই এ বিশ্বাসের স্পর্ধা তোমার হল কোথা থেকে?"

তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম এ ঠাট্টা নয়, মধুর পরিহাসও নয়, এ হচ্ছে সেই দুর্জ্ঞেয় মেয়েটির আর একটি অদ্ভুত খামখেয়াল।

'সে স্পর্ধা করবার ক্ষমতা তুমিই দিয়েছ, চিত্রা।"

তীক্ষ্ম কঠিন স্বরে সে বললে, "আমি দিইনি। তুমি নিজের অহঙ্কারে নিজেকে সে ক্ষমতা দিয়ে নীচ কাপুরুষের মতো তার সুবিধা নিচ্ছ। তুমি নির্লজ্জ, স্বার্থপর জানতাম কিন্তু তোমায় এতটা নীচ অমানুষ ভাবতে পারিনি। কি দরকার ছিল তোমার এখানে আসার? নির্লজ্জের মতো এখানে তুমি কি কাজে বসে আছ? যাই হোক, এখানে তোমার থাকাটা যে বিশেষ বাঞ্ছনীয় নয়—এ কথাটা তোমায় খুলেই বলতে হল—

যদিও এটা তুমি নিজেই বুঝতে পারলে আত্মসম্মান বজায় রাখতে পারতে।"

"আমি তোমার কথার অর্থ ভালো করে বুঝতে পারলাম না, চিত্রা, কিন্তু মনে হচ্ছে কাল রাত্রের গোটাকতক ঘটনা তুমি বড় তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ। আমায় ক্ষমা করে কাল রাতে অমন করে পা জড়িয়ে অশ্রুপাত করে কিন্তু অপ্রীতির পরিচয় তুমি ভালো করে দিতে পারনি!"

সে তীব্রকণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ জানি, আর কেউ বলে তোমায় আমি ভুল করেছিলাম। তুমি এত বড় নীচ অমানুষ যে সে ভুলের সুবিধা নিতে দ্বিধা করনি!"

"আর কে বলে ভুল করেছিলে, চিত্রা? জিতেনবাবু? তাহলে আমারই বা দোষ কি, চিত্রা? তোমার যে গভীর রাত্রে এমন করে জিতেনবাবুর পা জড়িয়ে কাঁদা অভ্যাস আছে তা আমি আর কি করে জানব!"

উপযুক্ত আঘাত দিতে পেরে অন্তরের পশুটা উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। সে আঘাতের নিষ্ঠুরতায় বিবর্ণ হয়ে গেল চিত্রার মুখ। কিন্তু যথাসাধ্য তীক্ষ্নস্বরে সে বললে, "সে কথা জানো আর না জানো, আমার ভাবী স্বামীর বাড়িতে বসে আমাদের অপমান করবার অধিকার তোমার নেই, এই সোজা কথাটা তোমার জানা দরকার। তুমি আজই যাও এখান থেকে।"

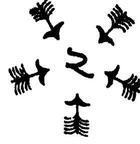
সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমি এবার শান্তস্বরে বললাম, "আজই আমি যাচ্ছি, চিত্রা। তোমার সমস্ত আচরণে কোনো সঙ্গতি আমি খুঁজে পাইনি, কিন্তু আমি জানি তোমার মনের কোণে চিরকালের মতো আমি একটি গোপন বেদনার কাঁটা হয়ে রইলাম, আর সেই আমার সান্ত্বনা।"

সে বিদ্রূপের হাসি হেসে বিবর্ণ মুখে বেরিয়ে গেল।

আজ দশ বছর পরে সেই মেয়েটির চিঠি এসেছে। এবং সে চিঠি ছিঁড়ে

পুড়িয়ে ফেলেছি। প্রেমের চেয়ে অহঙ্কারকে আমরা বড় করেছিলাম। সে অহঙ্কার আমাদের হৃদয়কে তৃপ্ত করতে পারেনি। হৃদয় হয়তো আজও তৃষিত। কিন্তু আজকের বাতাস যে দক্ষিণের নয়—উত্তরের!

গল্প শেষ হলে আমরা চুপ করে বসেছিলাম। হঠাৎ সুধীর বললে, "আপনার প্রেমের কাহিনীতে প্রেমের চেয়ে মানুষের অন্তরের অর্থহীন অহঙ্কার বড় হয়ে উঠেছে। প্রেমকে সে ব্যর্থ করেছে, কিন্তু এই ব্যর্থ বলেই আপনার প্রেমের গল্প গল্প হয়ে উঠেছে। ব্যর্থ না হলে প্রেমের স্মৃতি মানুষের একেবারে মুছে যায়, জীবনের এই এক অভিশাপ। যে কারণেই হোক ব্যর্থ হয়েই প্রেম গল্পে সার্থক হয়ে ওঠে। আমার ব্যর্থতা কিন্তু অন্য রকমের।"



মনে আছে সেটা আকাশ-প্রদীপ দেওয়ার মাস।

মানুষ মাটির শৃঙ্খলে বাঁধা হয়ে বন্ধ কারায় অন্ধের মতো অন্ধকারে হাতড়ে মরছে বটে, কিন্তু নক্ষত্রলোকের কথা সে তো একেবারে ভুলতে পারেনি, তাই গৃহশিখর থেকে মানুষ দীপ জেলে রাখে তারকাদের অভিনন্দন করতে, শুধু জানাতে, "ভুলিনি, আজও একেবারে ভুলিনি।" ছলনা, বঞ্চনা, কাড়াকাড়ি, মারামারি, দুর্বল আশা আর বিবর্ণ মুখের মাটির খেলাঘর থেকে আকাশের প্রতি তার ওইটুকু সম্ভাষণ!

বিদেশে এসে আস্তানা গেড়েছিলাম এক জায়গায় আর দুবেলা খেতে যেতাম আমার পাতানো মায়ের বাড়ি। একটা বাড়িরই মাঝখান দিয়ে ভাগ করে দুদিকে দুই গরীব গৃহস্থ থাকতেন। একদিকে আমার পাতানো মা আর তাঁর ছেলে আমার বন্ধু সহদেব, আর এক দিকে আর একটি পরিবার।

প্রথম দিন এসেই ভুল করে অনধিকার প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম। চকিতে

একটি মৃণাল-শুভ্র মুখের আভাস আর সঙ্গে সঙ্গে একটি তুষার-ধবল বসনে অবগুণ্ঠিতা মূর্তি সরে যেতে দেখে চমকে দাঁড়ালাম।
ওদিকে থেকে মা ডেকে বললেন, "ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস রে? এদিকে যে।"
দু'বাড়ির মধ্যে যাবার একটি দরজা থাকাতেই এই বিভ্রাট।
কাজের ফেরে দু'মাসের জায়গায় ছ'মাস লেগে গেল। শেষের দিকে যেতে আসতে রাত হত, মাকে বললে শুনতেন না, খাবার আগলে বসে থাকতেন অত রাত পর্যন্ত। দরজা দিয়ে ঢুকে অনেকটা পথ অন্ধকার। একদিন হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে একটু ব্যথা পেয়েছিলাম। মাকে অতিরিক্ত কষ্ট দেবার ভয়ে সে কথা জানাইনি।
তার পরের রাত্রে বারোটার সময় সন্তর্পণে দরজা খুলে পা বাড়াব, দেখি সামনে একটি প্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। ভাবলাম মায়ের কাছে কিছু লুকোনো থাকে না। তারপর থেকে প্রত্যহ দরজার কাছে একটি প্রদীপ জ্বলত।

সহদেব একেবারে সাধুমানুষ, নিরামিষাশী। কিন্তু আহার-বিষয়ে অহিংসা পরম ধর্ম আমার কোনোকালে ছিল না। সহদেব বলত, "শিকরে বুনোমানুষের খাদ্য আমিষ হতে পারে, সভ্য মানুষ আমিষ খাওয়ার ওপরের স্তরে উঠেছে।" আমি তর্ক করতাম। তবু এই নিয়ে মাকে বিব্রত করতে ভারি লজ্জা হত।
মাকে বলতাম, "আজকাল আমার মাছ না হলেও চলে, তুমি কেন ও নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হও মা!"
মা শুনতেন না, বলতেন, "তুই চুপ করে খেয়ে যা দেখি। তোর কিসে চলে না-চলে তোর চেয়ে আমি ভালো বুঝি।"
যেদিন থেকে তাঁর স্বামী মারা গিয়েছিলেন আর ছেলে সংসারে থেকেও

সন্ন্যাসীর মতো থাকতে আরম্ভ করেছিল, সেইদিন থেকেই মায়ের বাড়িতে আমিষের পাট উঠে গিয়েছিল। তাই মাকে এমন করে কষ্ট দিতে মন সরত না। একদিন বললাম, "তুমি যদি ফের কাল মাছ রাঁধ মা, আর তোমার এখানে খেতে আসব না বলে দিচ্ছি।"

তার পরদিনও যখন পাতে মাছ পড়ল তখন একটু রাগ করেই বললাম, "এত করে বললাম তবু তুমি শুনলে না, মা! তুমি কি ভাব এমন করে তোমায় দিয়ে মাছ রাঁধিয়ে খেয়ে সত্যি আমার কিছু সুখ হবে?"

মা হেসে বললেন, "না বাবা, না, আজ আর আমি রাঁধিনি, মাছ আনাইওনি—ওদের বাড়ির মেয়েটি নিজে রেঁধে দিয়ে গেছে। তাতে তোর আপত্তির কি আছে?"

কে এই মেয়েটি ভাবতে ভাবতে নীরবে খেতে লাগলাম। তারপর থেকে কিন্তু কোনোদিনই আহারে আমিষের অভাব দেখতে পাইনি। মাকে এই নিয়ে বলাতে মা বলেছেন, "কি করব বাবা, যে রকম করে কাকুতি-মিনতি করে দিয়ে যায়, না বলতে পারিনে।"

কে জানে, আমায় মাছ খাওয়াবার জন্য হয়তো মা'রই এ একটা ছল।

ছেঁড়া শার্টটার দিকে তাকিয়ে মা সেদিন বললেন, "দুটি ছেলেই হয়েছে আমার সমান পাগল, ওই ছেঁড়া জামাটা পরে বেড়াতে কি লজ্জাও একটু হয় না রে?"

আমি হেসে বললাম, "না, মা, তোমার ও ছেলেটির মতো ভোলানাথ আজও হতে পারিনি। সেলাই করবার উপায় নেই বলেই ছেঁড়া জামাটা চালিয়ে নিই।"

মা বললেন, "কেন, আমি কি মরে গেছি রে!"

"তোমার এখনো সেলাই করবার মতো চোখের জোর আছে তা তো জানতাম না মা!"

মা বললেন, "তুই জামাটা রেখে যাস তো, তারপর বোঝা যাবে বুড়ি মায়ের চোখের জোর আছে কি না আছে।"

তার পরদিন জামাটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেলাম, বললাম, "ক্ষমা কোরো মা, সেকালের মেয়েদের অত সোজা ভেবে বড় ভুল করেছিলাম বুঝছি। সেকালের মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের অন্যায় ধারণা বদলানো দরকার।"

মা হেসে বললেন, "না বাবা ও একালের মেয়েরই কাজ। সেকালের বুড়ির চোখের ফোঁড় সেলাই করবার মতো জোর থাকতে পারে, অমন পরিপাটি রিপু করবার মতো জোর নেই।"

আমি বললাম, "কি রকম?"

মা বললেন, "ও বাড়ির মেয়েটি বড় ভালো, নিজে চেয়ে নিয়ে গিয়ে সেরে দিয়েছে।"

অনেক কথা জিগগেস করতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু চুপ করে জামাটা নিয়ে চলে গেলাম।

সেদিন অন্ধ তারাহীন আকাশ পৃথিবীর উপর অর্থহীন গভীরতা নিয়ে তাকিয়েছিল। শুধু ঝড়বৃষ্টির উচ্ছৃঙ্খল মাতামাতিতে নির্জন পথ ধ্বনিত হচ্ছিল। রাত তখন একটা। অত ঝড় বৃষ্টি সত্ত্বেও মায়ের বাড়িতে বাধ্য হয়ে গেলাম, নইলে মা সমস্ত রাত ভাত নিয়ে বসে থাকবেন, ভাববেন, শুধু এই জেনে। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকলাম— ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। বাতাস হেঁকে যাচ্ছিল আর দুর্যোগের রাতের অভিসারিকা বর্ষার পাঁয়জোর বাজছিল অবিশ্রান্ত জলের ধারায় ঝম্ ঝম্ ঝম্! সহসা বাঁ পাশের দরজা খুলে গেল। লণ্ঠনের আলোয় আঁধার কেটে গেল, দেখতে পেলাম আভরণহীন একটি শুভ্র বাহুর শুধু অর্ধাংশ। একটা জিনিস সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম, কাপড়ের যে

প্রান্তটুকু বাহুর সঙ্গে দেখা যাচ্ছিল তাতে পাড়ের চিহ্নমাত্র নেই। মাথা নিচু করে ঘরে গিয়ে দেখলাম ঢাকা-দেওয়া খাবারের পাশে মা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

শুধু আমায় একটুখানি পথ দেখাবার জন্য দুরন্ত রাত্রির প্রহর কেউ বিনিদ্র হয়ে কাটিয়েছে—একথা কল্পনা করবার মতো দুঃসাহস বা অহঙ্কার আমার ছিল না, তবে...অদ্ভুত এই অপরিচিতা রহস্যময়ীর আচরণ!

যাবার দিন মা কাঁদতে লাগলেন, বললেন, "অত দূরদেশে কাজ শিখতে না গেলে কি চলত না বাবা, যা তোরা ভালো বুঝিস কর্, কিন্তু মায়ের মুখের দিকে চাইলিনে এই বড় দুখ্খু। একজন তো সন্ন্যাসী হয়ে রইল, তুই কাছে থেকে বিয়ে-থা করে সংসারী হবি দেখব বলে কত আশা ছিল, তা নয়, তুই চললি একেবারে একটু আধটু দূরে নয়—সাগরপারে দেশান্তরে। তোদের আর মায়ামমতা নেই।"

নত হয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, "আশীর্বাদ কর, মানুষ হয়ে তোমার কোলে ফিরে আসি তাড়াতাড়ি।"

মা বললেন, "আশীর্বাদ তো রাতদিন করছি বাবা, কিন্তু একটা কথা আজ আমার রাখতেই হবে তোকে। তোরা আজকালকার ছেলে এসব মানিসনে জানি, কিন্তু আজ শুধু না-হয় আমার খাতিরেই আর আপত্তি করিসনে।" তারপর আমার চাদরের খুঁটে পূজার ফুল বিল্বপত্র বেঁধে দিলেন। আমি বললাম, "ঠাকুর দেবতা মানি বা না মানি, এই ফুল বিল্বপত্রের সঙ্গে তোমার স্নেহের যে অক্ষয় কবচ বেঁধে দিলে সেটাকে তো না মেনে পারিনে।"

মা বললেন, "সে তোরা যা বলিস, আমরা ঠাকুর দেবতা বলেই মানি। আমি তো নিজে আজ ঘরের কাজ নিয়েই সকাল থেকে আছি, যেতে

পারিনি। ও-বাড়ির মেয়েটি আজ সকালে ঠাকুরবাড়ি গিয়েছিল, যত্ন করে এই নির্মাল্য নিজে এনে দিয়েছে—দেখিস যেন পায়ে না ঠেকে। আর সুভালাভালি পৌঁছেই একটা খবর দিতে ভুলিসনে বাবা। যতদিন খবর না পাব কেমন করে আমার দিন যাবে ভগবানই জানেন।" কান্না আসছিল। বিমর্ষ মুখে গাড়িতে উঠে বসলাম।

জীবনের ম্লান গোধূলি-বেলা এসেছে আজ! পাতানো মা আর নেই, বন্ধুও নেই, বিদেশীর দেশে স্বজনহীন আমি নিরুদ্দেশের পারের খেয়ার প্রতীক্ষা করছি। সেদিনকার সে রহস্যময়ী মেয়েটির কোনো খবর আর কখনো পাইনি, পাবার চেষ্টাও করিনি। সে কেমন, একটু চকিত আভাসে ছাড়া ভালো করে দেখতেও পেলাম না। জীবনের পথধূলিতে তার ক'টি চিহ্ন আছে মাত্র—শুকনো ফুল আর পাতা, আর রিপু-করা একটা পুরোনো জামা। শুধু শুনেছিলাম সে একটি তরুণী বাল-বিধবা। আজও বিচার করতে সাহস হয় না, সেদিন যে আশাতীত মমতা, যে অযাচিত করুণা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম তা কিসের—স্নেহের, না...

দীনেশ বললে, "সামান্য ক'টি জিনিস নিয়ে তুমি মন্দ রোমান্স খাড়া করোনি! কিন্তু তোমাদের দুজনেরই প্রেম কৈশোরের প্রেম, স্বপ্নই সেখানে বেশি। তোমাদের প্রেমে তোমরা নিজেদের কল্পনাকে ভালোবেসেছ। কিন্তু প্রেমের কল্পলোকের মতো তার মর্তও আছে। অবশ্য সত্যিকার প্রেম এই মর্ত থেকে উঠে কল্পলোকে পাখা মেলে। কিন্তু তোমরা যখন শুধু কল্পলোকের কথা বললে, আমি পাল্লা ঠিক রাখবার জন্যে শুধু মর্তের কথাই বলব গল্প করে।"



“সর্দার ফিন মাতোয়ালা ভাইল বা!”

“সত্যি নাকি?”

“হাম ক্যা ঝুট বোলী! ছোটকীকে তো মারত বা।”

এই রাস্তাটির নাট্যখানি তাহলে আরম্ভ হয়েছে। সময় হয়েছে বটে! সুরকির চৌবাচ্চা ভর্তি হয়ে গেছে। পেষাই-জাঁতা নীরব হয়েছে। খোয়া ভাঙা শেষ হয়েছে। গাড়োয়ানেরা শেষ খেপ দিয়ে এসে গাড়ি খুলে দিয়েছে। নদীতে মজুর-নারীদের প্রসাধন সারা হল। আর কাজ নেই। জীবনটা বড় একঘেয়ে নয় কি?

সুতরাং সর্দার তার দুই পত্নীর একজনের ওপর মৌতাতের তাতটুকু সঞ্চারিত করে দিয়ে সন্ধ্যাটা একটু সরস করে তুলতে চেয়েছে বই তো নয়!

আমারও জীবনটা একঘেয়ে হয়ে এসেছিল, তাই একটু মুখ বদলাবার

চেষ্টা করছি। বন্ধু দু'একজন এখনো আসে যায়, তারা জিগগেস করে, "একি ছেলেমানুষী হচ্ছে!"

বলি, "অনেকদিন কাগজে জীবন কাটালাম, এবার মাটি থেকে— সত্যিকারের মাটি থেকে রস টেনে ফুটে উঠতে চাই।"

তারা বলে, "কিন্তু এ যে নোংরা মাটি।"

"তবুও পাথরের চেয়ে সরস সত্য!"

সত্যি এ-রাস্তাটি ভালো লাগে। যেসব অগণন নাড়ীতে নগরের প্রাণ-ধারা বইছে, তার একটার ওপর হাত রেখেছি মনে করে একটা অকারণ গর্ব অনুভব করি। মনে হয়, যেখানে সত্যিকারের মানুষের সংযোগে ও সংঘাতে এই বিপুল নগরের প্রতিদিনের কাহিনী বিচিত্র হয়ে উঠেছে, সেখানে বসে এতদিনের জড়তা থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচলাম।

বন্ধুরা বলে, "তুমি এমন গোঁড়া ব্যবসাদার হয়ে বসবে কখনো আশা করিনি!"

সেই মামুলি উত্তর দিই: "পৃথিবীতে একমাত্র আশাতীতকে আশা করাই সার্থক হয়।"

কিন্তু সর্দার যেন একটু বাড়াবাড়ি করছে মনে হল। গিয়ে দেখলাম, বেশ ভিড় জমে গেছে। সর্দারের দ্বিতীয় পক্ষ প্রাণপণে তার পা জড়িয়ে ধরে উচ্চস্বরে যেসব সম্ভব ও অসম্ভব বিশেষণ তার প্রতি প্রয়োগ করছে সেগুলির সংগে পা জড়িয়ে ধরার মতো পতিপ্রাণতার নিদর্শনের সামঞ্জস্য করা একটু কঠিন বটে! কিন্তু একান্ত স্বামীভক্তিতে যে সে পা জড়িয়ে ধরেনি, এবং গলা জড়িয়ে ধরে সমান ধস্তাধস্তি করবার ক্ষমতা থাকলে শুধু পা জড়িয়ে ধরে দুর্বল প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা সে যে করত না, তা এ পাড়ার বাসিন্দা না হলেও বুঝতে বেশি দেরি হয় না। শুধু নিরুপায় আক্রোশেই সে স্বামীর চরণ মারের ওপর মার খেয়েও, ছাড়তে চাইছিল না। সর্দার এই অনন্য-

শরণা প্রেয়সীর আলিঙ্গন-সংস্পর্শ থেকে মুক্ত হবার নিষ্ফল হাস্যো-দ্দীপক চেষ্টায় সমবেত দর্শকের প্রচুর স্ফূর্তির খোরাক জোগাচ্ছিল। সর্দারের মাত্রাটা বোধহয় আজ একটু বেশি হয়ে পড়েছিল। এখন বাধা দিতে যাওয়া নিষ্ফল।

পাশেই পাঁচু-শা তার শীর্ণ শয়তানের মতো দেহ যথাসম্ভব লম্বা করে খয়রা গাড়োয়ানের ঘাড়ের ওপর দিয়ে সাপের মতো ফণা উঁচিয়ে এই উপাদেয় তামাশা—ছানি-পড়া চোখের ক্ষীণদৃষ্টিতে যথাসম্ভব গ্রাস করছিল। জিগগেস করলাম, "আজকের মামলাটা কি?"

বুড় একবার আমার দিকে ফিরে তাকিয়েই আবার মুখ ফেরালে। আমার প্রশ্ন তার কানেই যায়নি, তা ছাড়া এই রসাল তামাশার একটি মুহূর্ত থেকেও সে বঞ্চিত হতে চায় না। এর জন্য সে তার ভুসির দোকান পর্যন্ত ছেড়ে এসেছে। কিন্তু পেছন থেকে কে উত্তর দিলে—মাতাল হয়ে সর্দার আজ নাকি ছোটকীর ঘরে উপস্থিত হয়ে তাকে বাতাস করতে বলে এবং ছোটকী এতদিনের অবহেলার প্রতিশোধ স্বরূপ তাকে বড়কীর ঘরে যেতে সদুপদেশ দেয়। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য-ক্রমে বড়কী আজ অনুপস্থিত। তাই থেকেই বচসা ইত্যাদি।

সর্দারের কনিষ্ঠা স্ত্রীর চেয়ে জ্যেষ্ঠার প্রতি একটা অস্বাভাবিক পক্ষপাতিত্বের সংবাদ শুনেছিলাম বটে, কিন্তু আপাতত সর্দারের গৃহবিবাদের কারণ সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল আমার ছিল না। যে অযাচিতভাবে কৌতূহল নিবারণ করতে দ্বিধা করেনি তাকে হঠাৎ দ্বিধা পরিত্যাগ করে জিগগেস করে ফেললাম, "তুমি কি এই পাড়ায় থাক নাকি?"

কুলি-রমণী হলেও এতখানি রূপকে কিছু মর্যাদা না দিয়ে পারলাম না।

সে এবার একটু সপ্রতিভ হাসি হেসে সরে গেল। দৃষ্টির ভাষা বোঝবার জন্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো শিক্ষার প্রয়োজন হয়

না। ট্যাণ্ডেল কাছে এগিয়ে এসে চোখের ইশারা করে বললে, "ও আলগুর বাড়ি থাকে হুজুর।"

"আলগুর আবার বাড়ি হল কবে? লোকের গদি-ঘরের রকের ওপর শুয়ে তো চিরকাল কাটালে!"

"হ্যাঁ হুজুর, ও আজকাল পাঁচু-শার দোকানের পাশের ঘর দুটো নিয়ে আছে।"

রাত্রে দোতালার বারান্দায় বসে অন্ধকারে নদীর ঘাটে-বাঁধা ইটের ভরার চুল্লির ক্ষীণ রক্তাভ আলোয় মাঝিদের রান্নাবাড়ার ব্যস্ততা অন্যমনে লক্ষ্য করছিলাম। এই মাটির দোতালাটি সুরকি মিলের সাবেক মালিক ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছটির তলায় ঠিক নদীর ওপরেই তৈরি করেছিল। দোতালার বারান্দায় বসলে এই বাঁকা ছোট নদীটি বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় এবং ওপারে মাড়োয়ারী ধনীর সুবৃহৎ বাগানের স্নিগ্ধ রূপ গন্ধ ও বায়ু বিনামূল্যে উপভোগ করা যায়। অশ্বত্থ গাছটির তলায় নদীর কিনারায় এই অনাড়ম্বর মাটির দোতালাটি ভারি চমৎকার মানায়। এই রসবোধ থাকার জন্যেই বোধহয় ভূতপূর্ব কলের মালিক ব্যবসায় ফেল হয়ে আমাদের ঋণশোধ করতে পারেননি। শেষে কলটি আমাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। তারপর নদীর ধারের এই মাটির দোতালাটিই একদিন আমায় আকৃষ্ট করে এবং এই লাভহীন ব্যবসার সত্ত্ব বিক্রি না করে ফেলে একদিনের খেয়ালে এই দোতালায় উঠে আসি। তারপর থেকে এই কলের নাভিশ্বাসটুকু কোনো রকমে বজায় রাখবার চেষ্টাই করছি। মিশিরজী গদি-ঘরের রকে বসে ডিবিয়ার আলোয় সুর করে রামায়ণ পড়ছে। নিকটে শেড্ থেকে শ্রান্ত বলদ ও মোষদের নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে।

অন্যদিন এই মৃদু নিঃশ্বাসধ্বনি আর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দূরের

মিণ্টো ব্রীজের ওপরকার আলো ও চলন্ত ট্রাম মোটর গাড়ির অস্পষ্ট শব্দ, আর ওপারের বাগানের গাঢ় কালো ছায়া, এই সমস্ত মিলে আমার বিশ্রামটিকে বেশ একটি সুমধুর সঙ্গীতের মতো ঘিরে থাকে। আজ কিন্তু কেন জানি না বড় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

গাড়োয়ান, কুলি ও ঠিকাদারের সঙ্গীতের মজলিস আরম্ভ হল। হিন্দুস্থানীরাই এককালে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে। কথাটা সত্যি হতে পারে, কিন্তু এ কথাটাও সত্যি যে, সঙ্গীতকে এমন ভাবে গুমখুন করতেও আর কোনো জাত পারেনি। এই বিকট চামড়া-ঢাকা কাঠের খোলের আওয়াজের তালে তালে শার্দুল ত্রাসস্বরে যে বীভৎস নিদ্রাহরণ সুরের আলাপ চলছে, তা সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আর্তনাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

আরও অস্বস্তি বোধ হচ্ছে বোধহয় এই গুমোটের জন্যে। অশ্বত্থগাছের পাতাগুলি গভীর আলস্যের শিথিলতায় স্থির স্তব্ধ হয়ে আছে। কতকগুলিতে পথের গ্যাসের বাতির আলো এসে পড়েছে। হঠাৎ মনে হল, গত আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত আল্‌গু গোলার জমিতে তার বলদ ও গাড়ি রেখেছে, তার ভাড়া এখনো আদায় করা হয়নি। কাল সকালেই অকর্মা সরকারটাকে ধমকে দিতে হবে। খানিক বাদে কিন্তু নিজের মনেই হাসলাম। নিজের সঙ্গে ধাপ্পাবাজি চলে না।

সকালে গদিতে বসেছিলাম, হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে খাড়া হয়ে বসে জিগগেস করলাম, "রায় কোম্পানির মাল পাঠানো হয়েছে?"

"বাবু!"—দরজা থেকে ডাক এল।

সরকার খাতা থেকে মুখ তুলে দরজার দিকে চাইতেই ধমক দিয়ে বললাম, "আমি যা জিগগেস করলাম, কানে গেল?"

সরকার একটু বিমূঢ় হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলে, "আজ্ঞে?"

"আজ্ঞে কি? রায় কোম্পানির মাল পাঠানো হয়েছে?"

দরজা থেকে আর একবার ডাক এল, "বা—বু!"

সরকার একবার সেদিকে তাকাতে গিয়েই অপ্রস্তুত হয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, "হয়েছে, আজ্ঞে এইমাত্র পাঠালাম।"

তার বিব্রত বিমূঢ় ভাব দেখে হাসি আসছিল। কিন্তু গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললাম, "আর আশুবাবুদের সুরকি পাইল করবার লোক পাঠানো হয়েছে?"

এবার সে দরজার দিকে তাকাবার লোভ সংবরণ করে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে না, এখনি হবে।"

"এর আগেই পাঠানো উচিত ছিল," বলে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

সে ঘাড় বাঁকিয়ে অসীম কৌতুকভরা দৃষ্টিতে একবার আমার যাবার পানে তাকিয়ে ঈষৎ হাসল বলে মনে হল ..বোধহয় আমার গাম্ভীর্যকে বিদ্রূপ করল।

সরকার বেচারীর স্খলনটুকু ক্ষমা করা যেতে পারে। নারীর একটা রূপ আছে, তাকে ঘৃণা করা হয়তো যায়, কিন্তু তার প্রতি উদাসীন হওয়া যায় না। এ সেই রূপ।

কিন্তু তাই বলে নিজেকে নত করব না। কলঘরের দিকে চললাম, খানিকটা দূর গিয়ে মনে পড়ল, লাঠিটা গদিতে ফেলে এসেছি। সত্যি এ ভুল অনিচ্ছাকৃত। একবার মনে হল, গিয়ে কাজ নেই, কিন্তু তারপরই মনে হল শেষকালে ওই একটা কুলি-নারীর রূপকে ভয় করতে হল! সরকার তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কি কথাবার্তা বলছিল। আমাকে দেখে অকারণে থতমত খেয়ে বললে, "এই যে বাবুকেই বল না।"

"কি হয়েছে?"

সরকার কম্পিতস্বরে বললে, "কসৌলিয়া বলছে কি—"

"কে কসৌলিয়া?"

"আজ্ঞে, এই আল্গুর বৌ—"

সরকারের অসহায় বিব্রত অবস্থা দেখে করুণা হচ্ছিল। কসৌলিয়া সরকারের সাহায্যে এগিয়ে এসে বললে, "মেরে নাম কসৌলিয়া হ্যায় বাবুসাব। হাম আল্গুকে পাস..." তারও দৃষ্টি নত হয়ে এল। আমি বাধা দিয়ে বললাম, "আচ্ছা বুঝেছি। তা আমার সঙ্গে কিসের দরকার?"

পাঁচু-শার জমির পেছনে আমার কাঠা তিনেক জমি পড়ে আছে। দুধের ব্যবসা করবার জন্যে কসৌলিয়া সে জমি ভাড়া নিতে চায়। সেখানে গোয়ালঘর হবে। এই দরকার।

আল্গুর প্রতি এতই দরদ, এর মধ্যে তার পয়সার সংসার করবার চেষ্টা! তবু ভাবলাম আপত্তি করব না, কিন্তু সরকার ওকালতি করতে এল।

"ও জমিটা বাবু অনেকদিনই তো অমনি পড়ে আছে, তাই বলছিলাম যে, বাবুর কোনো আপত্তি হবে না।"

কসৌলিয়ার দিকে ফিরে বললাম, "সরকারকে কত ঘুষ দিয়েছ বল তো?" সরকার নির্বোধের মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কসৌলিয়া একটু মুচকে হাসল।

"না, ও জমিতে আমার 'আধলা' জমা করতে হবে। ভাড়া হবে না।"

ছড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে মনে মনে বললাম, তোমাদের কলা-কৌশলের অন্ত নেই, কিন্তু নিজেদের শক্তিতে অত দৃঢ় বিশ্বাস থাকা ভালো নয়। আজকের হাসিটা তোমার বৃথাই অপব্যয় হল, কসৌলিয়া!

পাঁচু-শা দোকানের সামনে বসে বুক ভরে কাশছিল। ও নাকি বিশ বছর ধরে এই রকম করে কাশছে, তবু ওই শীর্ণ বুকের পাঁজরাগুলোর জোড় খুলে যায়নি! আমায় দেখতে পেয়ে কাশির মধ্যেই একটা হাত তুলে থামতে ইশারা করলে।

পাঁচু-শার কাছে ভদ্রতা আশা করা আহাম্মকি, সুতরাং আপনা হতেই দোকানের টুলটা টেনে নিয়ে বসলাম, তার কাশি থামবার অপেক্ষায়। রাস্তার ওপারের কলে পেতলের কলসীতে জল তুলতে তুলতে লেটুয়ার কিশোরী বৌটা এদিক ওদিক চাইছিল একটু চঞ্চলভাবে। কদিন থেকেই বোধহয় একটু চঞ্চলতা ওর লক্ষ্য করেছি।

ওদিকের কলঘর থেকে ট্যাণ্ডেল ডাকলে, "এ দরদীয়া!"

ট্যাণ্ডেল আমায় এখনো দেখতে পায়নি বোধহয়।

দরদীয়া কলসীটা কাঁখে তুলে নিয়ে ভ্রুকুটি করে বললে, "কাহেলা!"

"তোহার বহিন হও?"

"বহিন লেকে কা ভই?"

"হাম সাদী কর্‌ব।"

দরদীয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে আমার দিকে ফিরে একবার বোধহয় নীরবে নালিশ জানিয়ে কলসীর ভারে ভারকেন্দ্র পরিবর্তনের ফলে অসম-মাত্রিক ছন্দে চলতে চলতে বললে, "একগো বকরী হও।"

ট্যাণ্ডেল গলা একটু চড়িয়ে বললে, "উ তো তোহার শাস লাগি।"

লেটুয়ার বৌ আরো জোরে উত্তর দিলে, "তোহার নানী!"

পাঁচু-শা কাশি থামিয়ে জিগগেস করলে, "তুম মুসলমান হ্যায়, না হিন্দু হ্যায়?"

পাঁচু-শা তার বার্ধক্য, তার রোগ আর তার দুর্মুখের জোরে সাধাবণ ব্রিটিশ প্রজার আইনসংগত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমা মাঝে মাঝে লঙ্ঘন করে যায় এবং সে বিষয়ে তাকে সাবধান করতে যাওয়া মূর্খতা।

হেসে বললাম, "হিন্দু হ্যায়।"

"তব উ মুসলমান শালা কো উঠা দেতা নেহি কেঁও?"

বুঝলাম কাল যে খয়রার পিঠে ভব দিয়ে তামাশা দেখতে পাঁচুর বাধেনি, আজ পথের ওপরে তারই গৃহের অবস্থিতিটা কোনো মতে পাঁচুর বরদাস্ত হচ্ছে না।

বললাম, "ও মুসলমান যদি তোমার শালাই হতে পারল, তবে ওকে ওঠাবার প্রয়োজনটা কি?"

কথাটা ভালো করে বোধহয় পাঁচুর বোধগম্য হল না। বললে, "নেহি উঠাওগে! উ শালা কলকো পানি ছু দেতা, হামলোগোঁকো জাত মার দেতা, তবভি নেহি উঠাওগে?"

বুঝিয়ে বললাম যে আমার জমি থেকে উঠিয়ে দিলেও সরকারী কল থেকে জল নেবার অধিকার তার কেড়ে নিতে তো পারি না। পাঁচু এবার অন্য সুর ধরলে। বললে, ও যা মাংস রাঁধে, তার গন্ধ দোকানে আসে। বললাম, হাওয়ার গতি এদিকে হলে গন্ধ তো আসবেই।

এবার পাঁচু চটে গিয়ে সমস্ত বাঙালী জাতটারই ওপর তার বহুদিনের গবেষণামূলক মন্তব্য প্রকাশ করলে, "বাঙ্গালীলোক তো সব খৃষ্টান হো গয়া। আচার বিচার কুছ হ্যায় তুমলোগোঁকো? আঘ্রাণসে অর্ধ-ভোজন হোতা কি নেহি?"

এর আর কি উত্তর দেব? বললাম, "উঠি তাহলে পাঁচু! আপাতত খয়রাকে তুলতে পারলাম না।"

পাঁচু-শা উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে, "উঠাওগে নেহি? তব্ ঈয়াদ রাখনা, হাম পাঁচু-শা হ্যায়, উস্‌কো ঘরমে হাম আগ লগা দেঙ্গে।" আমায় হাসতে দেখে আরও চটে বললে, "ইয়ে জবানসে ঝুট নেহি নিকলতা, জরুর আগ লগা দেঙ্গে।"

কর্সোলিয়া দোকানের সামনে দিয়ে চলে গেল।

'আগ লগা দেঙ্গে'-টুকু বোধহয় সে শুনতে পেয়েছিল, অন্তত তার চক্ষের দৃষ্টিতে ব্যঙ্গের আভাস ছিল।

কলঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ট্যান্ডেল সালাম করে উঠে দাঁড়াল।

"আর কলটল বেগড়ায়নি তো?"

"না, হুজুর।"

"কি 'আর্মেচার' মেরামত করতে দিয়েছিলে, হয়েছে?"

"হ্যাঁ হুজুর, তার বিল হয়েছে পঞ্চাশ টাকা!"
"তোমার কাজ তো দেখি বেশ সুখের, বসেই থাক সারাদিন।"
"তা আগের চেয়ে হ্যাঙগাম কম বলতেই হবে। কয়লার ইঞ্জিনে যখন কাজ করেছি তখন এক দণ্ডের সোয়াস্তি ছিল না, হুজুর। একটা না একটা ফ্যাসাদ আছেই। আজ ধোঁয়া চিমনি দিয়ে ভালো করে না বেরিয়ে কলঘরেই জমছে, কাল বয়লারের 'সেফটি ভালভ্' খারাপ হল। আর এই গ্রীষ্মে আর এই আগুনের তাতে রোজ দু'সের করে রক্ত জল হয়ে গেছে, তার চেয়ে এ ঢের সুখের কাজই বলতে হবে। তবে কি জানেন, হুজুর—"
এবার ট্যাণ্ডেল সামলে নেবে বুঝলাম।
"এই ইলেকট্রিকের কাজে বিপদ আছে, প্রাণ নিয়ে টানাটানি—একটি তার অসাবধানে ছুঁয়েছ কি আর দেখতে হবে না.. নইলে কি আর অমনি এতগুলো টাকা মাইনে খাই, হুজুর!"
'এ কাজ বেশ সুখের' বলার ভেতর মাইনে কমাবার প্রস্তাব ট্যাণ্ডেল কোথায় খুঁজে পেল বুঝলাম না। জিগগেস করলাম, "তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ?"
সে একটু ভেবে বললে, "আমার বড় ছেলের বয়স, হুজুর, এই তেরো বছর। তার ভেতর কত কিছুই না দেখলাম, হুজুর, কত বেটা মেড়ো নেংটি পরে এসে এখন বড়লোক হয়ে গেছে। এই আল্গুই প্রথম যেদিন এল, হুজুর—" ট্যাণ্ডেল একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। "ওই সাতফুট দেহে দু'ফুট কাপড়ও ছিল না। তখন কেশববাবু গোলার মালিক। একদিন সকালবেলা কলে ফিতে ছিঁড়ে গেছে, আমি আর কেশববাবু কুলি লাগিয়ে ফিতে লাগাচ্ছি। আল্গু এসে বললে, 'নোকরী মিলেগা বাবুসাব?' কেশববাবু বোধহয় শুনেও ভ্রূক্ষেপ করেননি। আল্গু বার দুই তিন বললে, 'নোকরী মিলেগা বাবুসাব?' শেষে বিরক্ত হয়ে কেশববাবু তার দিকে ফিরে বললেন, 'হাঁ, মিলেগা, এই জাঁতাঠো

ঘুমানে হোগা, শকেগা?' আমরা হেসে উঠলাম। কিন্তু খাঁটি মেড়ো, ঠাট্টা বুঝল না। বললে, 'জরুর শকেঙ্গে।' আমরা আবার হাসলাম। আমাদের হাসতে মানা করে কেশববাবু তার দিকে ফিরে বললেন, 'তব্ ঘুমাও। দেখি ডাল রুটির চাক্কিটা!' হ্যাঁ, ক্ষমতা আছে বটে আল্গুর! ঘুরিয়ে দিলে জাঁতাটা।"

বিস্মিত হয়ে জিগগেস করলাম, "একলা?"

"হ্যাঁ হুজুর, একলা। তারপর আল্গু পাঁচ আনা রোজে চামচ ধরার কাজে বহাল হল। সেই আল্গু আজ ঠিকাদার হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে ধরাটাকে সরা দেখছে। সত্যি, হুজুর, ওর বারফাট্টাই আর সহ্য হয় না।"

ট্যাণ্ডেলের এই আলাপের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু বুঝতে পারা সত্ত্বেও এবং এই আলাপ কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা একটু আভাসে জানলেও, এ আলাপ বন্ধ করে দেবার মতো মনের জোর খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ট্যাণ্ডেল বোধহয় চকিতে আমার মুখের ওপর তাব দৃষ্টিটি বুলিয়ে কিছু পড়ে নেবার চেষ্টা করলে, তারপর গলা নামিয়ে আর একটু কাছে সরে এসে বলতে লাগল, "আপনারা তো খোঁজ রাখেন না হুজুর, ওই যে কসৌলিয়া বলে একটা মেয়েলোককে বাড়িতে এনে রেখেছে তার ওপর কি জুলুমটাই না করে। কসৌলিয়াও কি আর থাকতে চায় হুজুর, শুধু একশোটা টাকা আল্গু কবে ওকে দিয়েছিল, সেইটে শোধ না করে চলে গেলে আল্গু ওকে কেটে ফেলবে শাসিয়েছে। সেই ভয়েই—"

আর একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ট্যাণ্ডেল বললে, "আমায় একশোটি টাকা দিন, হুজুর, ওই আল্গুর দাড়া ভেঙে কসৌলিয়াকে এনে দিতে..." আমার কঠিন দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে ট্যাণ্ডেল সুর বদলে বললে, "পঞ্চাশ হলেও..."

ধমক দিয়ে বললাম, "চুপ স্টুপিড, ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে কথা কইতে না পার তাহলে এখানে তোমার চাকরি চলবে না, বুঝেছ?"

ট্যাণ্ডেল মাথা নিচু করে হাত জোড় করে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর!"

মিণ্টোব্রীজের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসেছিলাম। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ব্রীজের আলোগুলি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। অন্যমনে এই দুই অন্ধকার তীরের মাঝে স্বল্পালোকিত সেতুতে মানুষের ব্যস্ত চলাচল থেকে বোধহয় জীবনের একটা রূপক টানবার চেষ্টা করছিলাম। রূপকটা কতদূর সয় তাই দেখছিলাম—

"হুজুর!"

আজ বারান্দায় না বসে বেতের চেয়ারটা টেনে এনে নদীর ধারে এসে বসেছি। বললাম, "কি দরকার? এস।"

ট্যাণ্ডেল কাছে এসে সেলাম করে দাঁড়িয়ে বলল, "হুজুরের একটু ভুল হয়েছে, তাই জানাতে এলাম।"

খানিক চুপ করে থেকে উত্তর না পেয়ে ট্যাণ্ডেল বললে, "হুজুর 'আর্মেচার' মেরামতের জন্যে পঞ্চাশ টাকার বদলে একটা একশো পঞ্চাশ টাকার চেক দিয়েছেন ভুলে।"

"তাতে কি হয়েছে?"

অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। খানিক দাঁড়িয়ে থেকে ট্যাণ্ডেল বললে, "সেলাম হুজুর, আসি তাহলে।"

ট্যাণ্ডেল চলে গেল!

এতক্ষণ স্থির হয়ে বসেছিলাম। ট্যাণ্ডেলের দিকে মুখ পর্যন্ত ফেরাইনি। কিন্তু এবার বসে থাকা আর হল না, উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়ালাম। আজ গুমোট কেটে গেছে, অশ্বত্থ গাছের পত্রপুঞ্জের মাঝে অস্থিরতা জেগেছে। তবু কপালে অত্যন্ত উত্তাপ অনুভব করছিলাম। কয়েকবার পায়চারি করে বেড়ালাম। হঠাৎ মনে

হল, অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকটা একেবারে নির্জন। সন্ধ্যার পর এই বাড়ির এলাকার মধ্যে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণী থাকে না, সুতরাং বিস্মিত হয়ে জিগগেস করলাম, "কে?"

যে দাঁড়িয়েছিল, সে একটু নড়ল বোধহয়, কিন্তু উত্তর দিল না।

আরও কাছে এগিয়ে গেলাম।

"কে দাঁড়িয়ে? এ কি দরদীয়া! এত রাত্রে এখানে কি করছিস?"

দরদীয়া একটু সরে এল তারপর থেমে থেমে বলল, "হাম গোইঠা লেনে—" সে জায়গার ত্রিসিমানায় গোইঠা অর্থাৎ ঘুঁটে ছিল না।

"গোইঠা? এখানে গোইঠা কিসের?"

দরদীয়া নীরবে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ এই দরদীয়ার কদিনের অদ্ভুত আচরণগুলি মনে পড়ে গেল। এই আগের দিনই বিকালে সে খোয়া ভাঙা শেষ হলে এই নদীর ঘাটে স্নান করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে গেছে, এবং তার নিকটে গোলার ঘাট থাকতে এত দূরের ঘাটে স্নান করতে আসায় আমি একটু বিস্মিত হয়েছি। মনে পড়ল কদিন ধরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎটা কিছু বেশিবার হয়ে গেছে, এবং অনেক সময় এমন স্থানে ও এমন সময়ে হয়েছে, যেখানে ও যে সময়ে তার উপস্থিতি একটু বিস্ময়কর।

যৌবনের ছল ও কামনাকে আমি কৈশোরের চঞ্চলতা ও কৌতূহল বলে ভুল করেছি। বললাম, "ওপরে আয়।"

সে পেছনে পেছনে ওপরে এসে উঠল এবং ঘরের আলোয় এসে চোখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিগগেস করলাম, "দরদীয়া, রুপেয়া নিবি?"

সে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল এবং খানিক বাদে ঘাড় নেড়ে জানাল যে নেবে।

একটা দশ টাকার নোট তার হাতে দিলাম। বিস্মিত হবারই কথা এবং সে বিস্ময় লুকোবার চেষ্টা করলে না। বললাম, "এইবার বাড়ি যা, তোর শাস্ আবার খুঁজবে।"
দশ টাকার নোট পেয়েও সে এত বিস্মিত হয়নি। কিন্তু খানিক বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে নির্বোধের মতো আমার দিকে তাকিয়ে থেকে সে মুচকে হাসল এবং তারপর চক্ষে কটাক্ষ হেনে আমায় বুঝিয়ে দিলে, সমস্ত রাত ঘরে না গেলেও তার শাশুড়ি তাকে খুঁজবে না, তা ছাড়া আজ তো শাশুড়ি তার ভাতিজার বাড়ি গেছে।
গম্ভীর হয়ে বললাম, "আচ্ছা শাস্ না খুঁজুক, এত রাত্রে আর বাইরে থাকতে নেই, বাড়ি যা। আর আমি এখুনি দরজা বন্ধ কবে বেড়াতে বেরুব কিনা।"
সে এবার মুখ ভার করে বললে, "হাম ন যাই। হাম তোহার কাম করি।"
"না, আমার কাম করবার লোক আছে, তুই টাকা নিযে বাড়ি যা। কাল হাঁসুলি গড়াতে দিস, আমি আরো কিছু টাকা দেব'খন।"
আমার চাবির গোছাটা তুলে নিলাম।
"তোহার রুপেয়া তু লেহ'ল। তোহার রুপেযা কৌন মাঙত?"
নোটটা আমার মাথার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আবক্ত মুখে সে দ্রুতপদে নিচে নেমে গেল। আমি নিজের মহত্ত্বে একটু হাসলাম।
এই নবযৌবনার কোনো অঙ্গের সঙ্গে কোনো অঙ্গেবই সৌষ্ঠব সম্বন্ধে মতের ঐক্য ছিল না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে কিসের যেন একটা অভাব অনুভব করলাম, কোথায় যেন মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। বেলা বেশ হযেছে। অশ্বত্থ গাছের কটিদেশ পর্যন্ত সুরকি মিলেব টিনেব চাল ডিঙিয়ে

রৌদ্র এসে পড়েছে। সুরকি মিলের দিকে চেয়ে বুঝলাম, এই ফাঁকটা মানসিক নয়—'বাস্তবিক', অর্থাৎ দু'বছর ধরে প্রতিদিন প্রভাতে ওঠবা-মাত্র যে বিপুল বিকট ঘর্ঘর-ধ্বনি কর্ণপটাহকে অভিনন্দন করেছে সেই ধ্বনির অভাব। কল চলছে না।

এত বেলাতেও কল না চলার কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে তাড়াতাড়ি বেশ বদলে নিচে নেমে গেলাম। কলের সামনে দু'একজন কুলি চামচের ওপর ভর দিয়ে জটলা করছিল। জিগগেস করলাম, "কল চলছে না কেন?"

"ট্যাণ্ডেল জখম হুয়া, হুজুর।"

ট্যাণ্ডেল নাকি কাল রাত্রে কোথা থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে।

ট্যাণ্ডেলের বাড়ি তখুনি যেতে হল। সে ডান হাত ব্যাণ্ডেজ করে বিছানায় পড়ে আছে। আমাকে ঢুকতে দেখে একটু মৃদু হেসে বললে, "বসুন, হুজুর। এ গরীবের বাড়ি, আপনার উপযুক্ত জায়গা কি আমি দিতে পারি! দোষ নেবেন না, হুজুর।"

বসে বললাম, "ব্যাপারটা কি?"

"আক্কেল সেলামী, হুজুর! টাকাগুলো, আর এই হাতটা ফাউ।"

খানিক চুপ করে থেকে সে আবার বললে, "কাল রাত্রে গিয়েই ওই শয়তানীর সংগে দেখা করি, হুজুর। বেটি শোনবামাত্র রাজী হল। অনেক বেগ পেতে হবে ভেবেছিলাম। এত সহজে হবে আশা করিনি। তারপর শয়তানী আমায় একটু দাঁড়াতে বলে ভেতরে গেল আর আল্গুকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে এসে বললে, 'আল্গুর সংগে একটু পরামর্শ করলে ভালো হয় না কি?' "

ট্যাণ্ডেল চুপ করল।

"তারপর?"

"তারপর আর কি হুজুর! আল্গু বললে, 'উ-বন্দোবস্ত তো ঠিক

হ্যায়, অভি রুপেয়া দেখলাও।' ভাবলাম টাকা দিয়ে যদি আজ ত্রাণ পাই। টাকাটা তার হাতে দিলাম। টাকাটা নিলে হুজুর, সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের হাড়টা কাঁধ থেকে খুলে এল।"

খানিক হেসে ট্যান্ডেল বললে, "আর একটা কথা বলেছে, হুজুর, চলে আসবার সময়, কিন্তু সে আপনাকে আমি বলতে পারব না।"

"না বলতে পার চুপ করে থাক।"

সব চেয়ে রাগ হচ্ছিল এই কাপুরুষ নীচটার ওপর।

"কিন্তু আপনাকে সাবধান না করলে আমার অন্যায় হবে, হুজুর, সময়ে বলতেই হবে। আল্গু শেষকালে বললে, 'নোকর কা হাত তোড়া, আউর মনিবকো শির বাকি হ্যায়।'—আমায় মাপ করবেন, হুজুর।"

"আচ্ছা!" বলে বেরিয়ে এলাম।

খয়রা ঘরেই ছিল। বললাম, "তোরা কি মরে আছিস নাকি রে?"

সে লাফ দিয়ে উঠে বললে, "মরে আছি হুজুর! কার মাথা আনতে হবে বলুন না।"

"ঢের বাহাদুরী হয়েছে, থাক। তোর ঘরের সামনে বসে তোকে অপমান করছে, তাই কিছু করতে পারলি না আর মাথা এনে কাজ নেই!"

"বলুন না, হুজুর, কোন ব্যাটা অপমান করেছে, জ্যান্ত মাটির ভেতর পুঁতে ফেলব।"

"তার আগেই তোর ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে যে রে। তুই মুসলমান, তবু তোকে আমি উঠোব না, তাই তোর ঘর পুড়িয়ে দেবে।"

'কে? সে কোন ব্যাটা?"

"এই আল্গু।"

নিজের নীচতায় ও সস্তা ধাড়িবাজিতে হাসি পাচ্ছিল, ঘৃণাও হচ্ছিল। কিন্তু খয়রার উৎসাহ যেন কমে এল।

"কিরে? আল্গুর নাম শুনে ভয় পেলি নাকি?"

খয়রা আগের চেয়ে নরম গলায় বললে, "ভয় কি পাব, হুজুর, দুনিয়ার কাউকে ভয় করি না কিন্তু আল্গুর চেয়ে দোষ আছে বাবু পাঁচু-শার। আমার মনে হয় বাবু, ওই পাঁচু শয়তান আসল বদমাশ। পাঁচুকে আমি একবার দেখে নেব।"

আর খয়রার কাছে ভরসা নেই, তবু বললাম, "হ্যাঁ, ওই বুড়ো অথর্ব পাঁচুর আর কতটুকু জান্! আল্গুকে জব্দ করতে পারিস তবে বুঝি!"

"কেন পারব না হুজুর, ওই পাঁচু-শাকে ঠ্যাং উঁচু করে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে বিচুটি লাগাব, তবে আমার নাম খয়রা।"

বিরক্ত হয়ে খয়রার দরজার দিকে ফিরতেই পথের ওপার থেকে শুনলাম, "বাবু, একটু মেহেরবানি করে যদি পায়ের ধুলো দেন।"

আল্গু তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে।

ট্যাণ্ডেলের কথা মনে পড়ে বুকটা অনিচ্ছায় একটু কেঁপে যে উঠেছিল, এ কথা অস্বীকার করতে পারি না।

বললাম, "এখন বসতে পারব না, একটু কাজ আছে।"

আল্গু হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললে, "আজ্ঞে বেশিক্ষণ বসতে হবে না, দুটো বার্তাচিৎ করবার ইচ্ছা আছে আপনার সাথে।"

আল্গু ভালো করেই বাংলাভাষা শিখেছিল, কিন্তু উচ্চারণের দোষ তার যায়নি। সেই বিকৃত বাংলায় তার বিদ্রূপ তীক্ষ্ণতর লাগছিল। ভয় হল পাছে বলে বসে—ভয় পাচ্ছেন নাকি বাবু!

বললাম, "চল তাহলে। বেশিক্ষণ বসব না কিন্তু।"

আল্গু ভেতরে ঢুকে চিৎকার কবে ডাকলে, "আরে কসৌলিয়া, জল্দি কুর্শি লে আও, বাবু মেহেরবানি কর্কে—"

কসৌলিয়া একটা টুল এনে সামনে রেখে আল্গুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে মুচকে হাসলে।

"বৈঠিয়ে বাবু।"

বসলাম এবং নিজের কাছে নিজে সম্মান বজায় রাখবার জন্যে সহজ

স্বরে নিজের কথা পাড়লাম, "তোমার ভাড়াটা তো অনেক দিন বাকি পড়ে আছে, কবে দিচ্ছ, আল্গু! আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত তোমার গাড়ি গরু সব ছিল গোলার জমিতে, মনে আছে তো?"

"খুব মনে আছে, বাবু, কিন্তু ভাড়াটা মাফ করে দেবেন না বাবু?"

"কেন?"

"আমার আওরৎ ভি নেবেন, আবার ভাড়া ভি নেবেন?"

কসৌলিয়া দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, উচ্চস্বরে হেসে উঠল। বলবার কিছুই ছিল না। চুপ করে বসে সইতে লাগলাম। আল্গু বলতে লাগল, "তা আপনি আমীর লোক। আপনি যদি চান, বাবু, আমরা কি করতে পারি—আপনাদের মেহেরবানিতেই তো বেঁচে আছি।"

বিদ্রূপের আঘাতের ওপর কসৌলিয়া একটু করে হাসির বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

"আমি উঠি আল্গু, আমার বসবার সময় নেই, তুমি ভাড়াটা দিতে ভুলো না।"

"ভাড়াটা তবু মাফ করলেন না, বাবু? তা লিয়ে যান কসৌলিয়াকে। আমীরের ঘরে তবু সুখে থাকবে, তবে বাবু নোকর পাঠিয়ে ভালো করেননি, ও তো, বাবু, পহেলা নিজের জন্যেই লিতে চেয়েছিল! আপনি আমীর লোক চান সে আলাহাদ কথা। আর ও নোকর তাই বলে চাইবে! ওর হাতটা বাবু একটু মুচড়ে দিয়েছি। মোচড় খেয়েই তো বলে দিল যে আপনি পাঠিয়েছেন, ওর কোনো দোষ নেই।"

তার বিদ্রূপগুলি কি রকম উপভোগ করছি, দেখবার জন্যে বোধহয় আল্গু স্মিতমুখে আমার দিকে তাকাল। তারপর কসৌলিয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, "বাবুর নজর খুব ভালো আছে, কসৌলিয়া তো বড়ী খপসুরৎ আছে!"

আমি উঠে দরজার দিকে এগিযে গেলাম। কসৌলিয়া পেছন থেকে হেসে বললে, "আরে বাবু তো হামকো ছোড়কে চলা যাতা হ্যায়!"

"সে কি বাবু চলে গেলেন যে, তাহলে টাকাগুলো নিয়ে যান। মাল নেবেন না তবু টাকা দিয়ে যাবেন, সে কি হয়?"
কসৌলিয়া মুখ বেঁকিয়ে হাসতে হাসতে টাকার তোড়াটা হাতে দিয়ে গেল!
বেরিয়ে পড়লাম। আল্গু পেছন থেকে বললে, "ভাড়াটা আমি দিয়ে আসব, বাবু।"
এর চেয়ে ডান হাত স্কন্ধচ্যুত করে দিলে ভালো ছিল।

দরদীয়াকে গোইঠা দিয়ে যাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সে আসেনি।

গরুর গাড়ি পেঁাছে গিয়েছিল। এবার সবাই তাতে চড়েই রওনা হলাম। কিছুক্ষণ সবাই চুপ করেছিলাম। রমেশ বললে, "কিন্তু তোমরা সবাই যে প্রেমকে মধুর রূপেই দেখলে। তার মধ্যে যে ব্যর্থতা, যে বেদনা আছে, তাও তোমাদের কল্পনার চক্ষে মধুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে বিপুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস আছে তা তোমরা অনুভব করনি। একটা দিনের কথা বলি।"



মেঘাবগুণ্ঠিত ম্লান আলোর দিনটি কখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে বিলীন হয়ে গিয়েছিল টের পাইনি। প্রভাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই এক আলোকের গান্ধারের একঘেয়ে সুর—এ একেবারেই ভালো লাগছিল না।

ঘরে কে প্রদীপটি জেবলে দিয়ে গেছে।

তন্দ্রা ভেঙে যেতে সে চোখ মেলে বললে, "বাঃ, তুমি সেই থেকে এখনো বসে আছ! এমনি করে কি শেষে নিজের শরীরটাও মাটি করবে? না, না, যাও একটু বেড়িয়ে এস।"

এই তিন বছর ধরে প্রতিদিন এমনি অনুরোধ শুনে আসছি। উত্তর না দিয়ে ডান হাতখানি তার পাণ্ডুর কপালে রাখলাম। সে জিগগেস করলে, "জবর আছে?"

জবর ছিল। বললাম, "না, নেই।"

শীর্ণ হাত দুটি দিয়ে আমার হাতখানি কপাল থেকে সরিয়ে বুকের

ওপর চেপে ধরে বলতে লাগল, "মরতে আমার একটুও ভয় হয় না, নিজের দিক দিয়ে কোনো দুঃখও নেই, শুধু তোমার জন্যে কান্না পায়। তুমি যে আমায় বড্ড ভালোবাস, আমার মৃত্যু তুমি সইতে পারবে না, হয়তো পাগল হয়ে যাবে।"

আমার হাতের আঙুলগুলি নাড়তে নাড়তে বললে, "সত্যি বলছি, তুমি যদি আমায় আর একটু কম ভালোবাসতে, আমি সুখে মরতে পারতাম।"

একথাও অনেকবার শুনেছি। কিন্তু আজ যেন কোথায় খচ করে একটু বিঁধল। কেন?

বাইরে থেকে পায়রাগুলির কূজন শোনা যাচ্ছিল।

জিগগেস করলে, "এখন ক'জোড়া হয়েছে?"

"চার জোড়া—"

"মনে পড়ে সেই প্রথম গোলার জোড়াটি বারান্দার থামের ওপরের ফাটলে যখন ডিম পাড়ে, আমি দেখবার জন্যে আবদার করেছিলাম। তুমি আমায় উঁচু করে তুলে ধরে দেখাতে যাবে এমন সময় মা এসে পড়েছিলেন। তুমি তো আমায় মাটিতে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেলে, আর আমি এমন মুশকিলে পড়লাম—না পারি বসে থাকতে, না পারি উঠে পালাতে! সত্যি সেদিন ভারি লজ্জা পেয়েছিলাম!"

এক এক করে আমার আঙুলগুলি ধরে তার নীরক্ত শুষ্ক ঠোঁটে ছোঁয়াতে লাগল। খানিক বাদে আবার বললে, "বাবা! তুমি তখন কি দুষ্টুই ছিলে। বুড়ো মদ্দ হয়েও এমন সব ছেলেমানুষী দুরন্তপনা করতে..."

"ওগো, এতবার ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না? না, নিশ্চয়ই তোমার তন্দ্রা আসছে। এইবার তোমায় ঘুমোতে যেতেই হবে, নইলে শুনব না।"

চমকে উঠে লজ্জিত হয়ে বললাম, "না, কই ঘুম তো পায়নি। কি বলছিলে?"

"ঘুম পায়নি তো কি? নইলে আমার কথা তুমি শুনতে পাও না! তুমি ঠাকুরঝিকে ডেকে দিয়ে ওঘরে একটু গড়িয়ে এস। এ ঘরে থাকলে তো কিছুতেই ঘুমোবে না! কেবল আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, আমার কথা ভাববে। সত্যি যাও, নইলে কিন্তু আমি বড্ড রাগ করব।"

লীলাকে ডেকে দিয়ে পাশের ঘরে গেলাম। ঘুমোতে ভালো লাগছিল না। জানলা দিয়ে আকাশের কালো, কোমল আর্দ্র অন্ধকারের পানে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। ভাবছিলাম—বিধাতা মানুষকে ভালোবাসেন হয়তো, কিন্তু মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর পরিহাসও করেন।

আপনা থেকে চেয়ারে হেলান দিয়েই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। অতৃপ্ত তন্দ্রালসতা থেকে জাগিয়ে লীলা বললে, "বৌদি বড় ছট-ফট করছে, দাদা, তোমায় খুঁজছে।"

চেয়ার থেকে ওঠবার শক্তিও যেন পাচ্ছিলাম না; ঘুমের জড়িমায় চোখের পাতা ভারি হয়েছিল—খুলতে কষ্ট হচ্ছিল। জোর করে চোখটাকে দুহাতে রগড়ে উঠে বললাম, "তুই ঘুমোতে যা, আমি যাচ্ছি।"

মনে হল প্রেমের প্রেরণায় প্রিয়তমাকে সেবা করতে পাবার লোভে উৎফুল্ল হয়ে যেন যেতে পারছি না, শুধু যেন কর্তব্যের মর্যাদা রাখতে যাচ্ছি। নিজের ওপর রাগ হল—ঘৃণা হল। জোর করে ভাবলাম—কখ্খনো না, আমার প্রেম তেমনিই আছে। প্রথম মিলন রাত্রির আগ্রহ নিয়েই আমার সরযূর কাছে যাচ্ছি। অপরাধ-বোধের গ্লানিটা দূর হয়ে গেল বোধহয়।

বড্ড ছটফট করছিল। ঘরে যেতে বললে, "গা-টা বড্ড জ্বালা করছে, একটু ঠাণ্ডা বিছানায় শুতে ইচ্ছা করছে।"

বিছানার অন্য পাশে অয়েলক্লথটা বিছিয়ে দিলাম, তারপর তার ক্ষীণ দেহটি বুকে তুলে নিয়ে অয়েলক্লথের ওপর শুইয়ে দেবার সময় সে

তার শীর্ণ কঙ্কালসার দুটি বাহু দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে, "অনেক দিন তোমার—"

লজ্জায় বোধহয় কথাটা শেষ করতে পারলে না। কিন্তু তখুনি মুখ সরিয়ে নিয়ে আবার বললে, "না, না, থাক, দরকার নেই! শেষে যদি তোমার আবার হয়।"

এই কথা ক'টি বলবার সময় তার চোখ দুটির অসীম অসহায় হতাশা একেবারে আমার বুকের ভিতর গিয়ে হৃৎপিণ্ডে মোচড় দিলে। মুখটি সরিয়ে এনে তার শ্রীহীন শুষ্ক হাড়-বেরুনো গালে অধর স্পর্শ করলাম।

জানি, সে তার অধরেই এই স্পর্শটি প্রত্যাশা করেছিল। তবু সে জানতে পারলে না এই আবেগহীন চুম্বনের অপমানটি।

ধীরে ধীরে তার রোগজীর্ণ লঘুভার দেহটি বিছানায় নামিয়ে দিলাম। অয়েলক্লথের ওপর শুয়েও সে অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছিল।

জিগগেস করলাম, "কি কষ্ট সরযূ?"

"কি যে হচ্ছে বলতে পারছি না, বুকের ভিতর কি রকম যেন করছে। আর যে যন্ত্রণা সইতে পারি না গো! মরণও হয় না—আমিও জুড়োই, তোমারও কর্মভোগ শেষ হয়।"

বলে ফেলেই চমকে আমার দিকে ফিরে কুণ্ঠিত কাতর চোখে তাকিয়ে বললে, "ওগো ক্ষমা কর, ভুলে বলে ফেলেছি, আর কখনো বলব না। বল, রাগ করনি? স্বার্থপরের মতো নিজের যন্ত্রণাটাই বড় করে দেখছি। আমি কি জানি না যে তোমার ভালোবাসা কত বড়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—একেবারে ভালো না হতে পারি—এমনি রোগ-যন্ত্রণা নিয়েই যেন আমি শুধু বেঁচে থাকি। আমার অসুখের জন্যে যে বেদনা তুমি পাচ্ছ, তার ওপর আমার পরিচর্যা করবার সুখটুকুও কেড়ে নিয়ে তিনি আর বেশি আঘাত তোমায় কোনোদিন যেন না দেন।"

হাঁপিয়ে উঠেছিল, একটু থেমে আবার বলতে লাগল, "সত্যি, ও আমার

মনের কথা নয়, হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তোমার পায়ে পড়ি সেদিনকার মতো রাগ কোরো না। বল, রাগ করনি?"

হায়! সত্যিই যদি রাগ করতে পারতাম! তাকে সত্যি কথাই বললাম, "না, রাগ করিনি, তুমি এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি।"

সত্যবাদী হতে বাধ্য হওয়ার দুর্ভাগ্যের জন্যেও মানুষ কখনো কখনো নিজেকে ঘৃণা করে। সরযূ বললে, "তোমার কোলটা একটু পাতৃ। তোমার কোলে মাথা রাখলে হয়তো ঘুম আসবে।"

কোলের ওপর তার মাথাটা তুলে নিয়ে রোগে অযত্নে রুক্ষ শুষ্ক মলিন চুলগুলির ভেতর আঙুল চালিয়ে জট ছাড়াতে লাগলাম। চোখ বুজে স্থির হয়ে শুয়ে সে বলতে লাগল, "আজ ঘুমোবার চেষ্টা করতে বলছ আর মনে পড়ে তখন জাগিয়ে রাখবার জন্যে আমার ওপর কি উপদ্রবটাই না করতে? ঘুম-কাতুরে ছিলাম বলে নাকে নস্যি দিয়ে, কানের গোড়ায় শব্দ করে, চুল ধরে টেনে কি নাকাল করতে, আমায় কিছুতেই ঘুমোতে দিতে না।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে, "আর একদিন মড়ার মাথা এনে কি রকম ভয় দেখিয়েছিলে। ঘুম থেকে আঁতকে উঠে চিৎকার করে তোমার গলা জড়িয়ে ধরেছিলাম। তার পরদিন সকালে মা তোমার কীর্তি শুনে তোমায় কি রকম বকুনি দিয়েছিলেন, মনে আছে?"

কেন জানি না আজকাল সরযূ এমন করে জীবনের পুরোনো পাতা উলটে অতীতের স্মৃতিগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চায়। ওর নিজেরই অজ্ঞাতে কি বর্তমানের ত্রুটি ওর অন্তরাত্মার কাছে ধরা পড়ে গেছে! যে সব তুচ্ছ কথা আমি কবে ভুলে গেছি, সে সব ও এমন করে মনে রেখেছেই বা কেমন করে বুঝতে পারি না।

সমস্ত শরীর ও মনে অত্যন্ত অবসাদ অনুভব করছিলাম। সরযূ খানিক বাদে ঘুমিয়ে পড়ল। এই তিন বছরের কথা ভাবছিলাম—কেন এমন পরিবর্তন হয়ে গেল এই তিন বছরে, দুটি মানুষের হৃদয়ের

জগতে? ভাবলাম, কাল সোহাগের প্লাবনে সরযুকে অভিভূত বিস্মিত করে দেব। ভণ্ডামির চূড়ান্ত হয়ে যাক! এই মৃত্যু-পথিকের সন্ধ্যাটি, কিছুতে না পারি মিথ্যা দিয়েও স্বপ্ন-ভঙ্গের হাহাকার থেকে বাঁচিয়ে, সুন্দর করে রাখব। বিধাতার বিদ্রূপের সমস্ত বেদনা আমাকেই লাগুক; কপটতার হীনতার বেদনা আমি একাই গোপনে বহন করব! কিন্তু শ্রান্তিতে যে হৃদয় মন দেহ ভেঙে পড়ছে। যে হৃদয় তার দুঃখের বেদনায় হাহাকার করছে, সেই হৃদয় থেকেই প্রেমের সে সর্বনাশা শিখা কেমন করে ম্লান হয়ে গেল।

ওর শিয়রের কাছে দেওয়াল ঠেসান দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ওর কাশির শব্দে জেগে উঠলাম! কাশতে কাশতে ক্ষীণ কণ্ঠে কয়েকবার ডাকলে, "ওগো, শুনছ।" শ্রান্তিতে, ঘুমের ঘোরে চোখ খুলতে ইচ্ছা করছিল না। নিজেকে ধিক্কার দিয়েও চোখ বুজে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। ও আরও দু'একবার ডাকলে। নিজেকে অভিসম্পাত দিলাম, তবু চোখ খুললাম না। শেষে কাশতে কাশতে ও বোধহয় নিজেই খাটের তলা থেকে পিকদানিটা তোলবার চেষ্টা করলে।
হঠাৎ শব্দ শুনে চমকে স্তম্ভিত হয়ে দেখি সরযু খাট থেকে মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে। দুর্বল শরীরে নিচে থেকে পিকদানি তুলতে গিয়ে বোধহয় টাল সামলাতে পারেনি।
খাট থেকে লাফিয়ে নেমে ওকে বুকে তুলে নিলাম। শ্বাস কষ্ট হচ্ছিল, বুকে বোধহয় আঘাত লেগেছিল। অনেকদিন এ রকম করে কাঁদতে পারিনি। জানি না অনুতাপের জ্বালায় এমন করে কেউ জ্বলেছে কিনা! অনেকক্ষণ পরে, অনেক শুশ্রূষায় জ্ঞান হল।
নির্লজ্জ পিশাচের মতো আবার জিগগেস করতে হল, "কি দরকার ছিল, সরযু? আমায় ডাকনি কেন?"

রোগ-পাণ্ডুর শীর্ণ সুরে হেসে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, "ডেকেছিলাম, তুমি বড় শ্রান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিলে, শুনতে পাওনি! ভাবলাম পিকদানিটা তুলতে পারব।"

"এই দুর্বল শরীরে কি তুলতে যেতে আছে। না হয় মেঝেতেই গয়ের ফেলতে।"

"সেও তো আবার তোমাকেই পরিষ্কার করতে হত, মাথাটা অমন ঘুরে উঠবে ভাবিনি।"

"আর কখনো অমন কোরো না। আজ যে আর একটু হলে মারা যেতে, তাহলে আমার আপশোষের সীমা থাকত না, সরযূ।"

আমার হাতটি নিয়ে নিজের দুই গালে বুলোতে বুলোতে সে বললে, "তোমার তো দোষ নেই।"

নীরবে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

এতদিন পরে আজ সরযূর শিয়রে বসে এতদিনকার নিজেকে নিজে ঠকাবার কদর্য চেষ্টায় ক্ষান্ত হয়ে, প্রথম অসঙ্কোচে সহজ মনে সহজ প্রার্থনা জানিয়ে বললাম, "ভগবান! সরযূকে তাড়াতাড়ি নাও। নিজেকে যে আর বিশ্বাস করতে পারি না। মৃত্যু-বর দিয়ে তাকে নিষ্ঠুর সত্যের আঘাত থেকে স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনা থেকে আড়াল করে রাখ। আমার অন্তরের একান্ত অনুরোধ—তাকে তাড়াতাড়ি নাও। মানুষকে এত দুর্বল করে গড়ে এমন অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলা কি তোমার বিষম পরিহাস নয়, বিধাতা?"

শেষ রাত্রে হঠাৎ বৃষ্টি নামল। জানালা দিয়ে আসা বাদল হাওয়ায় প্রদীপটা কেঁপে নিবু-নিবু হয়েও আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সরযূ বললে, "আমি ভেবেছিলাম বুঝি নিবে যাবে।" তার মনটি আলোর মতন আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

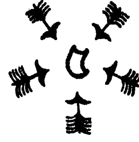
শীর্ণ হাত দুটি বাড়িয়ে আমার মাথাটা নামিয়ে ধরে রক্তহীন অধরে মৃদু ক্ষীণ হেসে সে বললে, "যদি আবার একেবারে ভালো হয়ে উঠি?"

আর একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপটা নিভে গেল।

আবার জ্বালাবার জন্যে ওঠবার চেষ্টা করতে সরযূ বললে, "না, থাক, বেশ আছি।"

বাইরে তখন বর্ষার মৃদঙ্গ বাজছিল।

গরুর গাড়ি মন্থরভাবে চলেছে। শ্রীপতি এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। ছইএ ঠেসান দিয়ে একধারে চোখ বুজে পড়ে ছিল। হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, "তোমাদেব সকলেব গল্পই শুনলাম। তোমরা হলে এ যুগের অতি-সভ্য মানুষ—শুধু মনেব জটিল পথেই তোমাদের চলা ফেরা। তাই তোমাদের গল্পে হয় শুধু মনের সঙ্গে মনের সঙ্ঘাতের পেঁচালো কাহিনী, নযতো অসুস্থ মনেব বেদনামষ আত্মপ্রকাশ। তোমাদের প্রেমের গল্পের অধিকাংশ জাযগা তোমরা নিজেরাই জুড়ে বসে আছ। কিন্তু মানুষ যেখানে নিজেব সম্বন্ধে অতখানি সচেতন হয়ে ওঠেনি, প্রেম যেখানে প্রতিপদে নিজেকে বিশ্লেষণ করে চলে না, জীবন যেখানে এখনো নিজেকে বোঝে না—সেখানকার কাহিনী তোমরা কেউ বলনি—শোনো—"



বিধাতাপুরুষ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন।

তারপর শোধরাবার চেষ্টাও করেছিলেন বিস্তর—কিন্তু আর কি হয়?—হলই বা বিধাতার নিজের ভুল!

ত্রিভঙ্গমুরারী হয়েই ভূমিষ্ঠ হল—প্রতি অঙ্গের সঙ্গে প্রতি অঙ্গেরই যেন আড়ি! এই ছত্রিশ বছর তেমনি আড়িই তো চলেছে!—পথে যেতে সবাই একবার মুখ ফিরিয়ে তাকায়—মরুভূমির প্রাণীবিশেষের কথাই মনে পড়ে বটে সে গতি-ভঙ্গি দেখলে।

আর কিছু মনে হয় কি?

সহজে মনে হবার যো নেই। সে মুখ দেখতে পেলে তো! দূর থেকে যদি বা সম্ভব, কাছে থেকে সে মুখ দেখা যায় না। সাধারণ লোকের হিসাবে সেটা প্রায় মেঘলোকেরই কাছাকাছি!

শচী স্বামীকে টুল থেকে নামিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলে, "সরো, সরো, ও কি তোমার কর্ম, এস তো গণেশ, পেরেকটা মার দিকি এখানে।"

গণেশ কোল থেকে ছেলেটাকে নামিয়ে রেখে গিয়ে পেরেক ধরে।

শচী বলে, "কেমন? বলেছিলাম কি না, গণেশ দাঁড়িয়েই নাগাল পাবে?—তুমি তো টুল চেয়ার রাজ্যি শুদ্ধ এনে মনুমেণ্ট বানাচ্ছিলে!"

চারু আধ-ব্যাজার আধ-তামাশাভরে হেসে বলে, "সবাই তো আর মই-এর খরচা বাঁচাবার জন্যে তালগাছ হতে পারে না!"

"নাগো না—তালগাছই ভালো, অনেক কাজে লাগে!—এই আমার মাথা খেয়েছে! ও আমার শ্রাদ্ধ করতে কি করলে, ঠাকুরপো?"

গণেশ হাতুড়ি থামিয়ে ভীত বিহ্বল নির্বোধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "কেন?"

"আ তোমার মরণ, আবার বল কেন? পেরেকটা মরতে পিটতে গিয়ে সবটা পুঁতে ফেললে! ছবি কি তোমার মাথায় টাঙাব? গাড়োল কোথাকার!"

গণেশ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। চারু বৌয়ের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে।

"তুমি হেসো না বাপু, আমার গা জ্বালা করে, একটা কাজ কি এ গো-মুখ্যুটাকে দিয়ে করাবার যো নেই! যা করতে বলব, তাতেই একটা কীর্তি করে বসে থাকবে! তোমার মাথায় কি আছে বলতে পার? ষাঁড়ের গোবর?"

অত্যন্ত অপরাধীর মতো গণেশ মিট-মিট করে তাকায়!

টুলটা টেনে নিয়ে বসে চারু বলে, "তোমাদের যদি দয়া মায়া একটু থাকে! তুলতেও যতক্ষণ, নামাতেও ততক্ষণ। বেচারীকে একেবারে আকাশ থেকে ধপ করে মাটিতে ফেলে দিলে!"

অপ্রতিভভাবে গণেশ হাসে একটু!

শচী ধমক দিয়ে বলে, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই হবে? আমার আর কাজ নেই!"

ছেলেটা তখন দাওয়ায় পড়ে চিৎকার শুরু করেছে!

"ওদিকে ছেলেটাকে তো নামিয়ে দিয়ে এলে ভিজে মেজেয়, ওই সর্দি-কাশির ওপর! না, তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না!"

থতমত খেয়ে গণেশ বলে, "পেরেকটা তুলে ফেলব, বৌদি?"

"পুঁতেছ তো মরতে পিটতে গিয়ে, এখন কি দিয়ে তুলবে? শুধু হাতে?"

শুধু হাতেই গণেশ পেরেক ধরে টান দেয়—যেমন প্রকাণ্ড লম্বা, তেমনি কদাকার হাতগুলি!

"সাধে কি তোমায় বলদ বলি, শুধু শুধু অমনি টানলে পেরেক ওঠে! হাতুড়ি দিয়ে এধারে ওধারে বেশ করে ক'বার ঘা দাও আগে!"

কিন্তু হাতুড়ির দরকার হয় না। শুধু হাতের টানেই পেরেক উঠে আসে।

"মাগো! কি হাতের জোর গো! শুধু হাতে পেরেকটা তুলে ফেললে!" শচীর ডাগর চোখ আরও ডাগর হয়ে ওঠে—বিস্ময়ে, প্রশংসায়, আনন্দে। দশ বছরের মেয়ের মতো লজ্জায় গণেশ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

চারু বলে, "কি আর বাহাদুরী! আলগা একটা পেরেক, হাত দিয়ে তুলেছে বৈ তো নয়!"

"তাই তো! তোমার হাড়ে হত না," শচী ছবিটা তুলে ধরে বলে, "নাও, পেরেকটা ভালো করে ঠুকে ছবিটা টাঙাও—আবার যেন উল্টো করে টাঙিয়ো না, তোমাকে বিশ্বাস নেই।"

অত্যন্ত সাবধানে গণেশ পেরেক ঠোকে। হাতুড়ির ঘা দেয়, আবার থামে, ভালো করে একবার দেখে, একবার বৌদির মুখের দিকে তাকায়, তারপর আবার একটা ঘা দেয়।

"তবেই হয়েছে! ওই একটা পেরেক মারতে তুমি বুড়ো হয়ে যাবে দেখছি। আমার মুখের দিকে চাইছ কি বল দেখি! জোরে আর দুটো ঘা দাও।"

আশ্বস্ত হয়ে গণেশ আর এক ঘা দেয়। মাটির দেয়ালে খানিকটা চিড়

ধরে। শচী ভয় পেয়ে বলে, “থাক, থাক, খুব হয়েছে! মুখ্যু গোঁয়ার কোথাকার!”

ছবি টাঙানো হয়। ছেলেটাকে চারুর কোল থেকে নিয়ে আবার গণেশ বলে, “আমি তোমায় খুব ভালো একটা ছবি এনে দেব, বৌদি। কাল ফুটপাথে দেখে এসেছি। সে রকম ছবি একটিও ঘরে নেই তোমার।”

“কি রকম?”

“গো-মাতার ছবি! এই যে গরুকে মুখে সবাই ভগবতী বলে, তার গায়ে কোথায় কি দেবতা আছে কেউ জানে?”

“ও, সে ছবি ঢের দেখেছি।”—শচী রান্নাঘরের দিকে যায়।

অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে গণেশ বোঝাতে চেষ্টা করে—“এ গো-মাতার ছবি সে রকম ছবি মোটেই নয়, এ হল আসল ছবি। শাস্ত্রমতো যেখানকার যে দেবতা, যে দেবতার যে রূপ, তা ক'টা ছবিতে মেলে? এ হল ধ্যানে পাওয়া ছবি! ছবিওয়ালাকে দেখলেই তোমার ভক্তি হবে, বৌদি।”

চারু বলে, “বুঝলাম তো সবই, কিন্তু ঘরে আর ছবি ঢুকলে তো আমাদের বেরুতে হয়!”

ঘরে আর জায়গা নেই বটে। আসবাব-পত্রে ভরাট হয়ে, ছোট মাটির ঘরের দেয়ালের যেটুকু সামান্য অনাবৃত ছিল তা ছবিতে ঢাকা পড়েছে। শচীর ছবির শখ! জার্মানীর ছাপাখানার আমদানী দেব-দেবীতে ঘর বোঝাই। সদ্য-টাঙানো ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলে, “ও গো-মাতার ছবিতে কাজ নেই! এই রকম ছবি হত তো বুঝতাম।”

‘এ রকম ছবিটি’তে শিল্পীর কেরামতিতে কাঁচি-দিয়ে-কাটা রাধাকৃষ্ণ যুগল-মূর্তিতে বিলেতের শীতকালের নদী-তীরের দৃশ্যের মাঝে আবির্ভূত হয়েছে। গণেশ বিমর্ষ হয়ে যায়, বলে, “তুমি পছন্দ করবে ভেবে আমি তাকে দু'আনা বায়না দিয়ে এলাম—”

“তৈরি ছবির আবার বায়না কি হে! কাছে আর পয়সা ছিল না বুঝি?” —চারু হাসে। গণেশ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

শচী বলে, "আচ্ছা, তুমি নিয়ে এস আজ।"
ঢঙ ঢঙ করে আটটা বাজে।
"ধর বৌদি, আবার আজ দেরি হয়ে যাবে।"—কোল থেকে ছেলেটাকে শচীর কোলে নামিয়ে দিতে যায়।
"আর একটুখানি ধর, ঠাকুরপো। এই ভাতের ফেনটা গেলেই আসছি।"
ক্ষীণ আপত্তির স্বরে গণেশ বলে, "আমার কিন্তু আপিসের দেরি হয়ে যাবে, বৌদি।"

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে শচী বলে, "বিকেলে কিন্তু সকাল সকাল এস, ঠাকুরপো, ও যা দস্যি ছেলে কারুর কাছে থাকবে না নইলে—"
গণেশ তখন গলির কাদা ডিঙোতে ডিঙোতে দৌড়ে চলেছে। ন'টায় কোন মোটরের কারখানায় তাকে হাজিরা দিতে হয়। এখনো নাওয়া আছে, খাওয়া আছে...চারু শচীর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকে হাসে।

নিজের দাদাও নয়, বৌদিও নয়। নিজের কেউই নয়। বুড়ো মা বলে, "তোর কোন কুলের কে তারা যে দিন-রাত তাদের বাড়ি পড়ে থাকিস— কুকুরের মতো? বাড়ির সঙ্গে শুধু খাওয়া আর ঘুমের সম্পর্ক?"
বড় ভাইয়েরা বলে, "সে সম্পর্কটুকু রাখা কেন? দরকার নেই! খাবার শোবার বন্দোবস্তটাও যেন কাল থেকে সেখানেই হয়!"
ঘাড় হেঁট করে গণেশ যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি গ্রাসের পর গ্রাস ভাত মুখে তোলে। চিবোবার সময় পর্যন্ত নেই।
ভায়েরা আরও বলে, "ওর কি? ওর কি লজ্জা সরম আছে? আমাদের যে মাথা কাটা যায়! লোকে যখন বলে, 'ওগো তোমার ভাইকে দেখে

এলাম এক হাতে ছেলে এক হাতে বাজার নিয়ে পালেদের বাড়ি ঢুকছে'—'ওগো তোমার ভাইকে দেখে এলাম পালেদের টিনের চালে পুডিং লাগাচ্ছে'—তখন কি মনে হয় বল তো?"

গণেশ ততক্ষণে খাওয়া সেরে আঁচাতে গেছে।

ভাইয়েরা বলে, "সামনেই এই, লোকে পেছনে তো বলতে কিছু আর বাকি রাখে না। আর সত্যিই তো, বয়সটা কি কম হল! বিয়ে হলে এত দিনে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে হত যে!"

বুড়ি মা এবার রেগে গিয়ে বলে, "দোষ তো তোদের, তোরা বিয়ে দিলি না, কিছু করলি না, ছেলেটা কেমন যেন হয়ে গেল। এখনো কি পারিস না একটা ধরে-টরে এনে দিয়ে সংসারী করে দিতে? তা তোদের চাড় আছে কি? ওর কপালে আছে অনেক দুর্গতি, সে আমি জানি।" বুড়ি মায়ের চোখে জল আসে।

ভাইয়েরা জবাব দেয়, "সব জেনে শুনে ন্যাকা সাজ কেন বল তো? চেষ্টার কিছু কসুর হয়েছে! কে বিয়ে দেবে তোমার ওই মুখ্যু কার্তিক ছেলের সঙ্গে! বুদ্ধির নামে তো অষ্টরম্ভা! রোজগার কববার ক্ষমতা আছে? যে এল সেই পেছিয়ে গেল, আর তাও ধরে করে যা রাজী করালাম, তোমার ছেলে তো তাদের ভাগিয়ে দিলে।"

বুড়ি মায়ের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে সেই অনুপস্থিত অপরিচিতার ওপর, "সে নচ্ছার মাগী যে গুণ করেছে ওকে—"

ঘুরে বেড়াত বেওয়ারিশ কুকুরের মতো—না কাজ, না লক্ষ্য। এমনি বেয়াড়া গড়ন হয় বটে দু'একটা মানুষের। সংসারের কোনো খোপেই খাপ খায় না। খোপ নইলে কি মানুষের চলে! তাই বসত গিয়ে হয়তো একবার নিজের বৌদিদের কাছে। খানিক বাদে উঠে যেতে হত। ছোট-বৌদি একটা খাম এনে হয়তো বলত, "দাও না ভাই ঠিকানাটা লিখে

ইংরিজিতে"—একটু মুখ টিপে হেসে বলত, "তোমরা বেটাছেলে, তোমরা না লিখে দিলে আমরা যাই কোথায় বল তো?"

আরও সাধ্য-সাধনা করে বলত, "না হয় বাংলাতেই দাও ভালো করে লিখে!"

মেজ-বৌদি আর চাপতে না পেরে খিলখিল করে হেসে উঠত।

সমবয়সীদের মজলিসে গিয়ে বসত—একটি পাশে সংকুচিতভাবে। সেখানে তখন আলাপ চলেছে হয়তো—ওই বয়সে যেমন আলাপ চলে!

"তা নয়। মেয়েদের ধরা দিতে নেই, ধরা দিলেই ওরা পেয়ে বসে"—

উদগ্রীব হয়ে গণেশ কান খাড়া করে থাকত।

"থেকে থেকে ঘা দিতে হয়, ওদের মজাই এই, যেদিকে ঘা খায় সেই-দিকেই লতিয়ে পড়ে!"

রুদ্ধদ্বার কোন রহস্যপুরীর নিষিদ্ধ গোপন সংবাদ! শুনতে যেন তার ভয় হত।

"তা কি বলা যায়! কাউকে ঝড়ের মতো ছিনিয়ে নিতে হয়, কাউকে বা অনেক সাধ্য-সাধনা করে অনেক কষ্টে জয় করতে হয়—"

একজন গণেশকে দেখিয়ে বলত, "কি রকম হাঁ করে শুনছে দেখ!"

"আরে, গণেশ যে, এতক্ষণ বলতে হয়! কত বেয়াদবী করে ফেললাম!"

গণেশ সকলের হাসিতে লজ্জিতভাবে যোগ দেবার চেষ্টা করত।

"না, না, সে কি হয়, তোমায় কিছু বলতেই হবে!" টানা-হেঁচড়া করে তারা গণেশকে নাস্তানাবুদ করে তুলত!

"প্রেম সম্বন্ধে ছোট একটু বক্তৃতা হলেই চলবে। নাও, ওঠ দাঁড়াও।"

অনেক পরে অত্যন্ত নাকাল হয়ে কোনো রকমে ছাড়া পেয়ে সে বেরিয়ে যেত! আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, হয়তো অনেক অস্ফুট জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করবারও চেষ্টা করত।

তারপর হঠাৎ একদিন বৌদিদির সঙ্গে পরিচয়।

দুপুরবেলা হলেও মেঘলা দেখে গণেশ তার নিত্য নিয়মিত টহল-দারীতে বেরিয়েছিল এবং সম্প্রতি যে পল্লীতে তখন এসে পড়েছিল—পদমর্যাদা যে তার অত্যন্ত অল্প তা তার পথ দেখেই মালুম পাওয়া যাচ্ছিল। যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনি কর্দমাক্ত গলিপথটি কোনো রকমে যেন এঁকে বেঁকে নুয়ে সঙ্কুচিত হয়ে সেই ঘন-সন্নিবিষ্ট পল্লীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচে!

হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে কাদা বাঁচিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে গণেশ গলি-পথ পার হচ্ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়াল। "শুনুন!"—স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর! কিন্তু সঙ্কোচের আভাসমাত্র নেই তাতে। ফিরে তাকাল গণেশ।

ছোট একটি টিনের চাল-দেওয়া দু'কামরা বাড়ি। তারই টিনের দরজা ঈষৎ ফাঁক করে একটি কালো বছব কুড়িব মেয়ে মুখ বাব করে দাঁড়িয়েছিল। গণেশকে ফিরতে দেখে আর একবার অত্যন্ত স্পষ্টস্বরে ডাকলে, "শুনুন!"

গণেশ বিস্মিত ভীতভাবে এগিযে গিযে বললে, "আমায়—?"

"হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি কাছ থেকে একজন ভালো ডাক্তাব ডেকে আনতে পারেন?"

গণেশ তখনো বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি তখন স্বল্প ক'টি কথায় যা বুঝিয়ে দিলে তার সারমর্ম এই যে, তারা সম্প্রতি দু'তিনদিন এই নতুন পল্লীতে উঠে এসেছে, কাউকে চেনে না। স্বামী তাব এখন আপিসে গেছেন। হঠাৎ ছোট মেয়েটির কয়েকবার ভেদ ইত্যাদি হয়ে কেমন-যেন কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তাই উপায়ান্তর না দেখে তাকে এই পথের লোকেব শরণাগত হতে হয়েছে।

গণেশ ছুটে ডাক্তার ডাকতে গেল।

ডাক্তার এলেন, ব্যবস্থাও দিয়ে গেলেন।

মেয়েটি বললে, "তা হলে বরফ আর ওষুধটা তাড়াতাড়ি আনুন গিয়ে, কেমন? দেখবেন দেরি না হয়।" গণেশ আবার দৌড়োল।

ফিরে আসতে মেয়েটি বললে, "বরফটা ভালো করে কম্বলে জড়িয়ে এক কাজ করুন দেখি, রাস্তার কলে জল যদি এসে থাকে ওই বালতি করে এক বালতি জল এনে দিন তো! এ পোড়ার বাড়িতে আবার কল নেই।"

গণেশ জল নিয়ে এল। "এই যাঃ, ওটা যে ফুটো বালতি। আমি কি ওটাতে আনতে বললাম। নিন ঢেলে ফেলুন তাড়াতাড়ি ওই কলসিটায়! আর এক বালতি হলেই হবে।"

গণেশ বালতি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ছুটি পেল যখন—তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কাপড় গুটিয়ে নেবার কথা তার মনে ছিল না; গলির কাদায় খুঁটটা লুটোতে লুটোতে চলেছিল। এমন অদ্ভুত ব্যাপার, নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনার এমন ব্যতিক্রম তার জীবনে কখনো ঘটেনি। এমন অদ্ভুত মেয়েই বা কে কোথায় দেখেছে।

মেয়েটির বাঁ ভুরুর ওপর একটি ছোট কাটার দাগ আছে না? ছোট্ট কাটার দাগ—খুব ছোট্ট, বলতে গেলে চোখেই পড়ে না। কি আশ্চর্য! অত ছোট কাটার দাগ তার নজরেই বা পড়ল কি করে! আবার মুখটা মনে করতে গেলে কেবল কাটা দাগটুকুই মনে পড়ে!

দশ বছর আগের কথা।

কলেরাই হোক আর যাই হোক ছোট মেয়েটি একদিন সেরে উঠল। গণেশ খবর নিয়ে যায়। চারু ভুরু পাকিয়ে বিরক্তিব স্বরে বলে, "আচ্ছা বেয়াদব লোক তো বটে! খবব নেওয়া যে আর শেষ হয না। একদিন উপকার করেছে বলে বছর ভোর লোককে দিক করতে হয় নাকি।"

"চুপ কব, শুনতে পাবে!" শচী দবজা খুলে দেয, বলে, "এস, ঠাকুরপো।"

মাথাটা অনেকখানি নুইযে দবজা দিযে গলে এসে গণেশ একটু অকারণে হাসে। অত্যন্ত অশোভন দেখায। নিজেই শুধু-বকটাব ওপর বসে পড়ে বলে, "খুকি ভালো আছে?"

চাবু কিছু বলবাব আগেই শচী বলে, "হ্যাঁ, ভালো আছে।"

আব কথা কইবাব কিছু পায না। চুপ কবে বসে থাকাটাও অত্যন্ত অস্বস্তিকব বোধ হয। ওঠাও যায না অথচ। অকাবণে নিজেব বৃহৎ কদাকাব সৌষ্ঠবহীন হাত-পাগুলোব দিকে তাকায; কি যেন পর্য-বেক্ষণ কবছে। চাবু ক্যাম্বিশেব জুতোতে খড়ি লাগাতে লাগাতে অলক্ষ্যে ভ্রূকুটি কবে।

শচী কথা পাড়ে, বলে, 'ডাক্তাবটি ভালো, কেমন ঠাকুবপো?' ঠাকুবপো সম্পর্কটি আলাপেব দ্বিতীয দিন থেকে সে নিজেই পাতিযেছে।

গণেশেব মুখচোখ আবাব উজ্জ্বল হযে ওঠে, উল্লসিত হযে বলে "নিশ্চযই ভালো, কি বকম চট কবে সাবিযে দিলে! আমি প্রথমেই দেখেছিলাম কিনা, কাঠেব সাইনবোর্ড তো নয, একেবাবে শ্বেতপাথবে কালো কালি দিযে খোদাই কবা!"

চাবু বলে "আব একটু খুজে পেতে পেতলেব পাতেব সাইনবোর্ড দেখে যদি আনতে—"

গণেশ কিছুই সন্দেহ কবে না। সবলভাবে বলে, "তখন যে তাড়াতাড়ি!'

শচী মুখ ফিবিযে হাসি গোপন কবে। চাবু বূঢভাবে তাব মুখেব সামনে হো হো কবে হেসে ওঠে। নির্বোধেব মতো গণেশ সবাব মুখেব দিকে তাকায।

শচী স্বামীকে চোখ দিযে ইশাবা কবে বলে, 'কি মিছিমিছি হাস বল তো?"

খানিক বাদে গণেশ চলে যায়।

চারু বলে, "ফের কাল খবর নিতে এলে অপমান করে দেব।"

কিন্তু গণেশ আসে যায়। অপমান করা আর হয় না। পালেদের সংসা সে বেশ সয়ে গেছে। আজকাল সকালে আসে, বিকেলেও আসে। শা হয়তো বলে, "যাও তো ঠাকুরপো, ও ধোপানি-বেটি মরল কি বাঁচ একবার খবর নিয়ে এস তো!"

গণেশের কিছুতে বিরক্তি নেই।

চারু চুপ করেই থাকে। আড়ালে মাঝে মাঝে বলে, "আচ্ছা বেকুব শচী সে কথায় কান দেয় না।

নিয়মিতভাবে সকাল বিকেল গণেশ হাজিরা দেয়। ঝড় হোক, বৃ হোক, বজ্রাঘাত হোক—তার কামাই নেই। কাজ না থাকলে দেখা য রান্নাঘরের পাশের নির্দিষ্ট খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাটি সে ঠিক বসে আছে। সময় থাকলে বৌদির সঙ্গে গল্প করে—

"চাকরি ছেড়ে দেব বৌদি! অমন গোলামির চেয়ে পানের দোকান ক ভালো।"—ছেলেকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে বৌদি চুপ করে শোনে!

"হাজার হলেও এ হল নিজের স্বাধীন ব্যবসা! যখন খুশি আসব, যখ খুশি যাব—কেউ কিছু বলবার নেই! কি বল বৌদি?"

বিদ্রোহী খোকার জিভটা ঝিনুক দিয়ে চেপে গলায় দুধ ঢেলে দিে দিতে বৌদি বলে, "কেন? দেরি হয় বলে সাহেব কিছু বলেছে নাকি

গণেশ তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, "না, না, বলবে কেন, বলবে আবার কি খানিক থেমে বলে, "এ তো আর মিস্ত্রী পায়নি যে ধমকে দেবে, গাল গাল করবে।"

"মিস্ত্রীদের বুঝি গালমন্দ করে?"

"করে না আবার! চড় মেরে পর্যন্ত দেয়!"

বৌদি বলে, "মাগো, কি ঘেন্না! তুমি ও কাজ ছেড়ে দাও ঠাকুরপে পানের দোকান করলে চলবে তো?"

ধরা পড়ল কিনা অতশত গণেশ বোঝে না। বৌদির সহানুভূতিটুকু পেয়েই অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বলে, "খুব চলবে! তুমি দেখ না, আমি শিগগিরই কাজ ছেড়ে দিচ্ছি! তোমাদের সঙ্গে চেনা হওয়া ইস্তক কাজে ঢুকেছি—দশ বছর তো হল, আর কেন? কি বল, বৌদি?"

"তা বৈকি দাদা, দোকান করে ঘরে একটি বৌ আনো, আমরা একদিন লুচি খাই।"

হেসে ফেলে গণেশ বলে, "লুচি আমি অমনি খাইয়ে দেব।"

দশ বছর পরে এমন কেলেঙ্কারী যে করে বসবে কে জানত? বিকেল থেকে আয়োজন—গণেশ খাওয়াবে। সন্ধ্যা হতে না হতে এক চাঙারি বাজার এনে ফেলে গণেশ বললে, "নাও বৌদি, ধর।"

ছেলেপুলেগুলোকে কে শিখিয়ে দিয়েছিল কে জানে, তারা মুখস্থ আওড়াতে লাগল, "শুধু বাজার আনলে তো হবে না, কাকা, একটা কাকিমা নিয়ে এস, মা এত রাঁধতে পারবে না!"

শচী কৃত্রিম রাগে ধমক দিয়ে বললে, "চুপ, চুপ, সব ফাজিল কোথাকার! কাকিমা অমনি দোকানে কিনতে পাওয়া যায় কিনা! বললেই গিয়ে নিয়ে আসবে।"

মেজ-মেয়েটা বোকা। বলে ফেললে, "তুমিই তো শিখিয়ে দিলে!"

রসিকতাটুকু গণেশের বোধগম্য হল। হাসি তার আর থামে না, বললে, "বেশ, যা হোক! নিজে শিখিয়ে দিয়ে আবার ধমকানো হচ্ছে!'

সন্ধ্যাটা এমনি করে বড় স্ফূর্তিতেই গেল।

রান্নাঘর থেকে শচী ডাকলে, "অমন করে বসে থাকলে চলবে না, ঠাকুরপো! লুচিগুলো এসে বেলো দেখি।"

গণেশ গিয়ে লুচি বেলতে বসল। অনভ্যস্ত হাতের শাসন কি লুচিগুলি মানতে চায়! অদ্ভুত আকার হতে লাগল।

"ওমা! ওই তোমার লুচি বেলার ছিরি! বেলুনটা ধরতে পর্যন্ত জানো না! সরো, সরো—দেখিয়ে দিই।"

অপ্রশস্ত ছোট রান্নাঘর! গণেশ একটু সরে বসল, বৌদি পাশেই চাকি-বেলুন নিয়ে লুচি-বেলা শেখাতে বসে পড়ল।

জায়গা নেই, গায়ে গা ঠেকছিল! শচীর হাস্যোজ্জ্বল মুখের একটা দিক উনুনের আঁচের আভায় লালচে দেখাচ্ছিল। লুচি বেলার সঙ্গে সঙ্গে কানের পার্শি-মাকড়ির ভেতরের তারা স্বল্পালোকে চিকচিক করছিল।

কিসে কি হল বলা যায় না—গণেশের মনে হচ্ছিল কি এক অপরিচিত তীব্র অনুভূতিতে তার সমস্ত দেহ থরথর করে কাঁপছে। কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞানও বোধহয় তার ছিল না।

শচী বলছিল, "এই বেলা শিখে নাও, কালো কুচ্ছিত বলে আমাদের কাছে যা চলল, সুন্দরী বৌ এলে তো আর তা চলবে না, তখন সুন্দর করে বেলতেই হবে।"

নির্জন নিস্তব্ধ ঘর! শচীর চুড়িগুলি শুধু হাতের দোলায় মৃদুভাবে বাজছিল রিন-ঠিন! অত্যন্ত নিকটে মাথার খোঁপা থেকে কি একটা অস্পষ্ট গন্ধ আসছিল। মনে হচ্ছিল দেহের স্পর্শটি যেন তরল সুরার মতো সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ গণেশ দীর্ঘ কদাকার বাহু দিয়ে শচীকে সবলে বুকের ভেতর টেনে চেপে ধরল।

ব্যাপারটা অত্যন্ত আকস্মিক! শচী কিছুক্ষণ সেই আলিঙ্গনের মধ্যে নিস্পন্দভাবে হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল। তারপর তার মুখটা দুহাতে সবলে ঠেলে দিয়ে মুক্ত হয়ে, সজোরে বেলুনটা তার কপালে বসিয়ে দিলে।

"তবে রে হতচ্ছাড়া, তোমার পেটে পেটে এই বিদ্যা? বেরোও এখান থেকে—এক্ষুনি বেরোও!"

ভীত অসহায় পশুর মতো কাতরভাবে গণেশ চারিদিকে চাইছিল। স্বাভাবিক জ্ঞান তার এতক্ষণে ফিরে এসেছিল বোধহয়।

কিন্তু শচী তখন রাগে আত্মহারা। বেলুনটা দিয়ে আর-এক ঘা সে গণেশের মাথায় কশিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বললে, "এত বড় তোমার আস্পর্ধা, বেরোও বলছি এক্ষুনি—"

চারু ব্যাপারটিকে আরও কুৎসিত করে তুলল।

বহুকালের বিদ্বেষ তার জমা হয়ে ছিল বোধহয়। মেরে, ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েও হল না, খাবারের যা কিছু আয়োজন সে করেছিল সেগুলি পর্যন্ত তার পেছনে টান মেরে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে একটা অত্যন্ত কুৎসিত গালাগালি দিয়ে বললে, "নিকালো—"

তারপর দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল।

দশ বছরের একনিষ্ঠ পূজাব কোনো মূল্যই তারা দিলে না।

রাস্তায় পর্যন্ত লোক জড় হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা সবাই এক রকম বা আর এক রকম বুঝল। শুধু যাকে নিযে এত কান্ড সেই নির্বোধই সমস্ত মারধোর গালাগাল নীরবে সযে হতভম্ব হযে বেরিয়ে যেতে যেতে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না।

সকাল বিকেল আর কাটতে চায না। তবু বেবিযে যেতে হয! বাড়িতে থাকলে সবাই যেন সন্দেহেব চোখে দেখে। সময কাটানো গণেশেব দায় হয়ে ওঠে। আগেকাব মতো ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে না। মাঠে গিয়ে চুপ করে বেঞ্চির ওপর বসে থাকে; কারখানায় বাড়তি খাটনি খাটে।

বৌদিরা হেসে বলে, "জামাটা যে উল্টো হয়েছে, ঠাকুবপো!"

তাড়াতাড়ি জামাটা ঘুবিযে পবে গণেশ বেরিযে যায। বুকেব বোতাম দুটো ছিঁড়ে গেছে—লাগানো আর হযে ওঠে না। জীনেব ছেঁড়া মযলা কোটটা বুকের কাছে হাঁ করে থাকে। মাস দুযেক এমনি করেই গেল।

মাঠে চুপ করে বসে থাকতেও আর ভালো লাগে না। উঠে আবার হাঁটতে শুরু করে। সে তো আর কাবুর বাড়িতে যাচ্ছে না; অমনি পথ দিয়ে গেলে দোষ কি?

সকাল বিকেল পথ দিয়ে যায়—মাথা নিচু করে—কোনো দিকে তাকাতে

পারে না। শচী দরজায় সওদা করতে করতে দেখতে পায়। বড় মেয়ে জিগগেস করে, "হাসছ কেন মা?"
"কিছু না, অমনি।"

চারু ছেলে দুটোকে ধমকায়, "কোথায় পেলি অত চীনেবাদাম, লজঞ্চুস? বল্ কোথা থেকে পয়সা চুরি করেছিস?"
ছেলেগুলো কেঁদে ফেলে, "পয়সা চুরি করিনি।"
'তবে কোথায় পেলি?"
ছেলে দুটো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, ছোটটা বলে ফেলে, "কাকা কিনে দিলে—"
বড় বলে, "বলতে বারণ করে দিয়েছিল—"
চারু চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলে, "ফেলে দে নর্দমায়, এক্ষুনি ফেলে দে।"
ছেলে দুটো হতাশ হয়ে আরও জোরে কাঁদতে শুরু করে।
শচী এসে ছেলে দুটোকে সরিয়ে দিয়ে বলে, "যা, যা—খা গিয়ে যা, ফেলতে হবে না।"
চারু অত্যন্ত রেগে যায়, বলে, "ফেলতে হবে না কি রকম? পাজি! বদমাশ! তার এত বড় আস্পর্ধা, এখনো আমার ছেলেদের খাবার কিনে দেয়? আর সেই খাবার তুমি ওদের খেতে বল?"
শচী শুধু একটু হাসে। সে হাসির অর্থ বোঝা শক্ত!
'যা খুশি কর"—চারু রেগে যায়, কথা কয় না।

ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতে খাওয়াতে শচী বলে, "আনারসের চাটনি তোদের কাকা বড় ভালোবাসে রে।"
ছোট মেয়েটা বড় বেশি ন্যাওটা ছিল। চোখ দুটো তার ছলছল করে

ওঠে, বলে, "কাকাকে বাবা মেরেছে, কাকা আর আসবে না।"
শচী বলে, "না রে, দেখিস আসবে'খন।"
চারু সব শোনে। খানিক শচীর দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর তিক্ত-কণ্ঠে বলে, "তোমার কি লজ্জা নেই?—না সব ভুলে গেছ?"
তবুও শচী একটু হাসে—দুর্বোধ হাসি।
দরজাটা ঈষৎ খোলা। ফাঁক দিয়ে পথ দেখা যায়। শচী বললে, "ডাক! ডাক! বড়-খোকা! তোর কাকাকে ডাক!"
বড় খোকাকে আর দুবার বলতে হল না—সে ততক্ষণ ছুটে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু খানিক বাদে মুখ কালো করে ফিবে এসে বললে, "কাকা আসবে না, মা।"
"আসবে না কিরে? বলগে যা—মা ডিমের বড়া ভেজেছে, খেতে ডাকছে, না এলে রাগ করবে।"
বড়খোকা আবাব গেল।
এবার গণেশ এল। বড়খোকার পেছনে ফাঁশির আসামীর মতো অত্যন্ত ভীত সংকুচিতভাবে এসে দাওযার কোলেই বসে পড়ল মাথা নিচু করে। মাথা আর সে তুলতেই পারে না। ছোট মেযেটা কোলেব ওপর পড়ে চুল টেনে মুখ সরিয়ে জিগগেস কবলে, "এতদিন আসনি কেন?"
"তোর কাকা যে বিয়ে করতে গিয়েছিল, তাই আসেনি!"
ছোট মেযেটা জিগগেস করে, "বৌ কোথায় তাহলে?"
শচী হেসে বললে, "তোব কাকা যা তালগাছ, ট্যাঁকেই গুঁজে এনেছে বোধহয়—দেখ!"
গণেশ হেসে ফেলল। ছেলে-মেযেগুলো হাসাহাসি কবে হুটোপাটি লাগিয়ে দিলে, "কই দেখি কাকার ট্যাঁক—"
এমনি করে হাসি-তামাশা চলে। গণেশ মুখ তোলে, তাবপর হেসে কথা পর্যন্ত কয়। শচী সমস্ত সঙ্কোচ, সব লজ্জা কেমন করে যেন উড়িয়ে দেয়!

চারু যখন এল তখন রীতিমতো উৎসব শুরু হয়ে গেছে। গণেশ খেতে বসেছে এবং তাকে ঘিরে বসে ছেলেমেয়েদের চিৎকার চলছে। শচী পরিবেশন করছিল। চারু কোনো দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলে। ছেলেদের হট্টগোল থেমে গেল—তবু গণেশ কিছুই দেখেনি। সে তখন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে নিবিষ্টমনে খেয়েই চলেছে।

শচী হাসছিল, হাতের থালা থেকে সমস্ত বড়াগুলো তার পাতে নামিয়ে দিয়ে বললে, "আর আনব, ঠাকুরপো?"

"আনবে না? তুমি যত পার আন না দেখি! আমি খাব না বলেছি?"—গণেশের আজ উল্লাসের সীমা ছিল না। আবার এ-বাড়িতে ঢুকতে পাবে সে যে আশাই করতে পারেনি!

ঘরের ভেতর বসে চারুর কাছে এই নির্বোধ মূর্খের হাসি অসহ্য হয়ে উঠছিল।

শচী আর এক থালা বড়া এনে পাতে ঢেলে দিয়ে হেসে বললে, "দেখ, হবে তো?"

গণেশের তখন মাত্রাজ্ঞান কি আর আছে? বললে, "উহুঃ—" এবং অতি কষ্টে সেগুলো নিঃশেষ করে বললে. "আর কই বৌদি?" অতিভোজন দিয়েই সে আজ বৌদিকে সন্তুষ্ট করবে!

রান্নাঘর থেকে বড় মেয়ে বললে, "আর তো বড়া নেই মা!"

ছোট মেয়েটা শুনে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, "আমরা কি খাব, কাকা? তুমি যে সব খেয়ে ফেললে?"

অতিভোজনে বাহাদুরীর চেষ্টার এমন যে পরিণতি হতে পারে তা গণেশের ধারণা হয়নি। হঠাৎ লজ্জাকর অবস্থাটা ভালো করে উপলব্ধি করে তার মুখটি একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অত্যন্ত কাতর হতাশ দৃষ্টি বৌদির পানে তুলে সে বললে, "তুমি কেন বলে দিলে না, বৌদি?"

মনে হল এ অপরাধের মার্জনা সে আর আশা করে না।

শচী হাসছিল, বললে, "পাগল কোথাকার, তাতে কি হয়েছে!"

ঘর থেকে সে হাসি চার্ দেখতে পেল। সে হাসির মানেও যেন কিছু বোঝা গেল। এবং কেমন করে বলা যায় না তার মনে হল মনের সমস্ত গ্লানি-বিদ্বেষ যেন তার একেবারে কেটে গেছে!

শ্রীপতির গল্প শেষ হতে আমরা সব হেসে উঠলাম। আমি বললাম, "দেখ, শ্রীপতি, তুমি আসলে প্রচারক। প্রেমের গল্প বলতে বসে তুমি হঠাৎ নীতি প্রচার করে বসলে। কিন্তু প্রেম সত্যিই সৃষ্টিছাড়া। মানুষ প্রেমকে সৃষ্টির সকল জিনিসের ঊর্ধ্বে তুলে ধরেই এমন অপরূপ করে তুলেছে। নিজের কথা বলব না, সুরমা লজ্জা পাবে হয়তো, কিন্তু আর একজনের কথা জানি, তোমার মতো নীতির ছাঁচে জীবনকে গড়তে গিয়ে যে নিজেকে ব্যর্থ করেছিল।"



নিচে একটা গোলমাল হচ্ছিল শুনতে পাচ্ছিলাম।

উড়িয়া ঠাকুর অপূর্ব হিন্দীতে চেঁচাচ্ছিল, "নেই, নেই—এ গেরস্ত বাড়ি নেই হ্যায়, এ বাবুদের মেস্ হ্যায়—এখানে গিন্নীলোক থাকে না—বাহার যাও—এখানে ভিখ্ মিলবে না—"

চণ্ডীবাবু স্নানের ঘর থেকে তাঁর স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে ধমক দিচ্ছিলেন, "এইও খবরদার—উধার মাৎ যাও—হিঁয়া সাধু-সন্ন্যাসী লোককা খাতির নেহি হ্যায়।"

আরও অনেক প্রকার হিন্দীর নমুনা ওপরে এসে পেঁছচ্ছিল। মেসের এতজনের যে হিন্দীতে দখল আছে তা আগে জানতাম না। ওপরে যে কজন ছিলাম কৌতূহলী হয়ে বারান্দার রেলিঙের ওপর দিয়ে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেলাম!

ন'টা বাজে, সুতরাং নিচের উঠানে আপন আপন শ্লীলতার আদর্শ হিসাবে নগ্নতার নানা স্তরে পেঁছে আপিসযাত্রীদের তেল মাখার

ধুম পড়ে গেছে। এবং এই সম্মিলিত স্নানযাত্রীদের হিন্দীর স্রোতের মুখে পড়ে গেরুয়াধারী মুক্তকচ্ছ সন্ন্যাসী-গোছের একটি লোক হতভম্ব হয়ে কি একটা কথা বলবার যেন অবসর খুঁজছে। হিন্দীস্রোতে ক্ষণিকের জন্যে ভাঁটা পড়াতে কল্পিত হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী পরিষ্কার বাংলায় বললে, "আমি সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

সূর্যবাবু সকল বিষয়ে অগ্রণী; কিন্তু কিছুদিন হল অম্লশূলের জন্যে সন্ন্যাসীপ্রদত্ত মাদুলী ধারণ করা অবধি সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে মনোভাবের পরিবর্তন করেছেন। এতক্ষণ সেই জন্যেই কথায় বা কাজে কোনো প্রকার বৈরাচরণ থেকে বোধহয় নিবৃত্ত ছিলেন। এইবার সুযোগ পেয়ে বললেন, "সুধীরবাবু কেউ নেই এখানে। সুবোধবাবু আছে, সুরেশবাবু আছে, আমি স্বয়ং সূর্যবাবু আছি, সুদখোর শুঁটকো সুবলবাবু পর্যন্ত ছিল—কিন্তু সুধীরবাবু তো কেউ নেই—"

হাসাহাসির মাঝে চেঁচিয়ে বললাম, "আছে মশাই আছে, আমার ডাক নাম সুধীর।" কথাটা রসিকতার প্রয়াসেই বলেছিলাম। কিন্তু সন্ন্যাসী হঠাৎ আমার দিকে ফিরে অত্যন্ত আরক্ত দুটি চোখ তুলে বললে, "এই যে!" এবং আর বাক্য ব্যয় না করে সোজা বাঁয়ে ওপরে আসবার সিঁড়িতে উঠে পড়ল।

আমি কিন্তু মোটেই চিনতে পারলাম না। লোকটা উপরে উঠে এলে একটু অবাক হয়েই জিগগেস করলাম, "কি চান?"

লোকটা, কেন বলতে পারি না, কাঁপছিল। পাশেব তক্তপোশটার ওপর ধপ করে বসে পড়ে আমার দিকে আরক্ত চোখ দুটি সবিস্ময়ে তুলে বললে, "আমায় চিনতে পারলি না?—আমি নীপুদা!"

নীপুদা! বিশ্বাস না হবার কথা বটে। সে সুগৌর রঙে কে যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে, উজ্জ্বল সদা-স্মিত চোখ দুটি কোটরপ্রবিষ্ট জবা-ফুলের মতো রাঙা, তার কোলে কালি পড়েছে, বিবর্ণ মুখে একরাশ কাঁচাপাকা দাড়ি ও মাথায় ধূলি-ধূসর রুক্ষ এক মাথা জটা। সে দিনের

সে সুপুষ্ট সুগঠিত দেহের মাংস শিথিল হয়ে যেন হাড়ের কাঠামে কোনো রকমে ঝুলে আছে। এ যেন নীপুদার ছায়া।

মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল, "এ কি হয়েছ, নীপুদা!"

অত্যন্ত ক্লান্ত একটু ক্ষীণ হাসির আভাস বোধহয় সে পাণ্ডুর মুখের ওপর দিয়ে সরে গেল। তক্তপোশের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে নীপুদা বললে, "এ তোর তক্তপোশ তো?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই ধূলি-ধূসর পা দুটো ওপরে তুলে বললে, "দেখ্ দিকি যদি কতগুলো লেপকাঁথা যোগাড় করে আনতে পারিস চট করে।"

তারপর উবুড় হয়ে হাত দুটো বুকের ভেতর গুটিয়ে কাঁপতে কাঁপতে নীপুদা আরক্ত চোখ বুজল এবং খানিক বাদে দুটো লেপ ও দুটো তোশক ভালো করে মুড়ি দিয়ে বললে, "যা, এখন আর ঘণ্টা তিনেক আমাকে বিরক্ত করিসনি—খানিকটা জল-সাবু করে রাখিস।"

কিন্তু তিন ঘণ্টা বাদে পথ্য নিযে নীপুদাকে যখন জাগাতে গেলাম, নীপুদা গাঢ় রক্তবর্ণ চোখ তুলে এক অদ্ভুত বিকৃত মুখভঙ্গি করে বললে, "বিশ্বাস করিস না, মুখ দিযে আগুন বেব কবতে পারি? এই দেখ—ফু—হা—"

এবং ডাক্তার এসে বললে, "সিবিয়াস্ কেস্—ম্যালিগ্ন্যাণ্ট টাইপ অভ ম্যালেরিয়া"—এবং জটিল আরও অনেক কিছু।

এবার বোধহয় নীপুদাকে নিয়ে কিছুদিনের মতো পড়া গেল। আমার জ্ঞানে কখনো তাকে অসুস্থ দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

বিকারের ঘোরে বেহুঁশ অবস্থার ভেতর দিযে নীপুদার দিনরাত্রি যায। ডাক্তারের মুখ দেখে আশা হয না। রোগশয্যার পাশে বসে পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে।

বিশ বছর আগে এ মেস্ সে-ই এ বাড়িতে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিল।

চোখে দেখিনি—শুনেছি, ভূতের বাড়ি বলে বাড়িটার ভাড়াটে আসত না, ঝোপে ঝাড়ে জঙ্গলে প্রকাণ্ড বাড়িটা উচ্ছন্ন যেতে বসেছিল। সেই সময়ে নামমাত্র ভাড়ায় নীপুদা বাড়িওয়ালার কাছে বাড়িটি নিয়ে প্রতিবেশীদের অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করে উপরো-উপরি এক সপ্তাহ এখানে রাত্রিবাস করে ভূতের অমূলকতা প্রমাণ করে দেয়। তা সত্ত্বেও এ বাড়ির ভূতের অপবাদ দূর করে ভালো করে মেস্ বসাতে বছর দুই লেগেছিল।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে ভাষায় প্রাদেশিক টান আর শহরের সভ্য রীতি-নীতির অজ্ঞতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে, মরিয়া ও সংকুচিত এই দুই মিশ্রিত যে এক অপরূপ মনোভাব নিয়ে প্রথম শহরে এসে ওঠে, মেস্ হবার দশ বছর পরে ঠিক সেই মনোভাব নিয়ে সস্তা সীটরেণ্টের খাতিরে এই মেসে এসে উঠেছিলাম। পাছে কেউ অবজ্ঞা করে এই ভয়ে নিজেই সর্বদা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে ফিরতাম, এবং পাছে কেউ কথা না কয়, সেই ভয়ে কারুর সঙ্গে কথা কইতাম না।

কিন্তু মেসে আসার কয়েকদিন পবেই খাবাব ঘরে সকলেব সঙ্গে খেতে বসে নীপুদা যখন তার স্বভাবসুলভ উচ্চহাস্যের সঙ্গে আমাব কিঞ্চিত ভারাক্রান্ত পাতেব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কবে বলেছিল, "ওহে ম্যানেজার, একটা চার্জ ধোবো, কিন্তু দোহাই ভাই, এ্যাপ্রুভাবেব সাত খুন মাপ—আমার পাতের দিকে চোখ বুজে থেক।"—সেদিন কি কারণে বলতে পারি না, বিনা পরিচয়ে বেশি খাওয়ার সম্বন্ধে ইঙ্গিত, এই অমার্জনীয় অপরাধেও মোটেই অসন্তুষ্ট হতে পারিনি, এবং সেই প্রথম সকলের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিয়েছিলাম।

নীপুদার উচ্চকণ্ঠে একটি সরল আন্তবিকতা ছিল। শুধু তাই নয়—নীপুদার চারিধাবে এমন একটি রহস্য ছিল যা তরুণ মনকে আকর্ষণ না করেই পারে না। একটি মাত্র জিনিসের সে বড়াই কবে বেড়াত, "ওরে, ফিফ্‌থ্ ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছি, আমার কাছে ইংরিজি ফড়ফড়াসনি;

মাস্টারের গায়ে পানের পিক ফেলে স্কুলে ইস্তফা দিয়েছিলাম।" কিন্তু কবে কোথায়—মেসের কেউ জানতাম না। জিগগেস করবার সুযোগও সে কখনো দেয়নি। এই মেসের সে প্রতিষ্ঠা করেছিল এই পর্যন্ত সবাই জানতাম, তার পূর্বের জীবনের ওপরকার যবনিকা নীপুদা কখনো তুলত না। একদিন কৌতূহল দমন করতে পারিনি—অন্যায় আগ্রহ-ভরে নীপুদার অনুপস্থিতিতে তার হাতবাক্স লুকিয়ে খুলে দেখেছিলাম—অনেকগুলো কাগজপত্রের মধ্যে একটিমাত্র কাগজ প্রথম তুলে পড়েছিলাম। কবে কোন রেলের কারখানায় রহিম বক্স বলে কে ফায়ারম্যানের কাজ করেছিল তারই প্রশংসাপত্র! দেখলে সবই দেখতে পারতাম। কিন্তু বাক্স বন্ধ করে দিয়েছিলাম, আর এগুতে সাহস হয়নি।

তারপর পাঁচ বছর একসঙ্গে এক ঘরে কাটিয়ে নীপুদাকে দেখবার অনেক সুযোগ পেয়েছি। ধারণা ছিল যে তাকে বুঝতেও পেরেছি। ভেতরে প্রাণ থাকলে কম বয়সের বকাটে ডানপিটে ছেলেরা বড় হয়ে যা হয়, নীপুদা বোধহয় তার বেশি কিছু নয়। এই ধরনের আত্মীয়-স্বজনহীন বেপরোয়া দরদী লোকেরা যা করে থাকে, নীপুদা তাই করত। অর্থাৎ জাত-বেজাতের মড়া পুড়িয়ে, অস্পৃশ্য রুগীর সেবা করে, ন'শো নিরানব্বুই বছরের কড়ারে টাকা ধার দিয়ে, বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াত। আমি এখানে আসার আগে কালীঘাটের মন্দিরে কোন গরীব কুমারী মেয়ে কুড়িয়ে পেয়ে নিজের যথাসর্বস্ব দিয়ে, লোকের কাছে ভিক্ষা করে, এমন কি সাধ্যাতিরিক্ত দেনা করে তার বিয়েও নাকি দিয়েছিল। নীপুদার সঙ্গে যে পাঁচ বছর কাটিয়েছি সে পাঁচ বছর ধরে নীপুদা সে দেনা শোধ করেছে। দেনা-শোধের ব্যাপারটা আমার অলক্ষ্যেই চলত। দৈবাৎ জানতে পেরেছিলাম।

কিছুদিন ধরে দেখছিলাম নীপুদার আসবাবপত্র হালকা হয়ে আসছে। মেয়েদের মতো ঘর সাজাবার শখ ছিল নীপুদার। মেসের ছোট ঘর-

খানি সে নানান শৌখিন আসবাবপত্রে একেবারে ভর্তি করে রেখেছিল। এই নিয়ে মেসে অনেক হাসাহাসিও হয়েছে।

নীপুদা বলত, "তোদের বৌদি আসবে রে, কে আর যোগাড়যন্ত্র করবে বল্—নিজেই করছি।"

কিন্তু কয়েক মাস থেকে অনাগত বৌদির প্রতীক্ষায় ধৈর্য হারিয়েই বোধহয় আসবাবপত্রগুলি একে একে মুটের মাথায় কোথায় যে অন্তর্হিত হচ্ছিল, বুঝতে পারছিলাম না।

জিগগেস করাতে নীপুদা বললে কোন বন্ধুকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। ভালো কথা। কিন্তু এমন লোভী স্বার্থপর বন্ধু নীপুদার কোথায় এতদিন ছিল জানতাম না। দেখতে চেয়ে ফেরত দেবার কথা তাদের কখনো মনে থাকত না।

দামী দামী টেবিল, চেয়াব, আলমারি, ফুলদানি ইত্যাদি সব গিয়ে শেষে বড় আয়নাটাও যেদিন মুটের মাথায চাপাল সেদিন আব থাকতে পারলাম না; বললাম, "অনেক জিনিসই তো তোমার বন্ধুরা দেখলে, নীপুদা, নিজেদেব মুখগুলো তাদের আর নাই বা দেখালে—তারা ভয পাবে।"

খানিক দাঁড়িয়ে নীপুদা কি ভাবলে, তারপর ঈষৎ হেসে বললে, "দেখ্ তবে বাঙাল, তুই-ই মুখ দেখ্—কিন্তু আমাকে কুড়িটা টাকা দে, আজই চাই।"

"তা দিচ্ছি, কিন্তু সত্যি কথাটা বলবে কি, নীপুদা? মদ খাও না, রেস খেল না, বদখেযালি নেই, ধার দেওয়া ছাড়া খবচ কববার কোনো ফিকির জানো না, কিসের তাহলে এত টানাটানি তোমার?"

"বদখেয়ালি নেই তুই জানিস?" বলে নীপুদা মুটে বিদায় কবে দিয়েছিল। পরে জানিযেছিল—মেযের বিযের ঋণ।

এই পাতানো মেয়ের কথা নীপুদার মুখে অনেকবার শুনেছি। অত্যন্ত লম্বা কদাকার একটি জোয়ান লোকের সঙ্গে একদিন ঘরে ঢুকে নীপুদা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, "ওবে, আমার জামাই দেখ্।"

জামাইকে কেন জানি না দেখবামাত্র আমার অপছন্দ হয়েছিল; এক একটা লোককে হয়। লোকটার নোংরা ময়লা জামাকাপড়গুলো পর্যন্ত যেন তার গায়ে ভালো করে বসতে আপত্তি করছিল।

জামাই অতিশয় বিনয়ী; সংকুচিতভাবে ঘরে ঢুকে খালি খাটের গদিটা সরিয়ে একটুখানি জায়গায় আলগোছে বসে মেয়েমানুষের মতো অত্যন্ত সলজ্জভাবে বললে, "আপনি ধন্য, দেবতার সঙ্গে এক ঘরে বাস করছেন।"

তার জোয়ান ছ'ফুট চেহারার জন্যে এই মেয়েলিপণা আরও বিশ্রী লাগছিল। উত্তর দিতে পারলাম না। "তোমরা গল্প কর, আসছি—" বলে নীপুদা জামাইয়ের অভ্যর্থনার আয়োজন করতেই বোধহয় বেরিয়ে গেল। লোকটা বসে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে নীপুদার অসীম মহত্ত্বের কথা এমন করে বলতে লাগল যে নীপুদাকে না জানলে বোধ-হয় তাকে সাক্ষাৎ শয়তান বলেই ধারণা হত।

যাবার সময় জামাই ক'টা টাকা চেয়ে নিয়ে গেল—মেয়ের অসুখ, কিছু ওষুধ-পথ্য কিনে নিয়ে যেতে হবে। সে বিদায় হলে নীপুদাকে বললাম, "মাপ কর, নীপুদা, তোমার মেয়েকে ভাগ্যবতী ভাবতে পারলাম না—খবর নিয়ে দেখ, ও তোমার মেয়েকে বোধ করি প্রহার পর্যন্ত করে।"

অদ্ভুতভাবে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে নীপুদা বললে, "এক ঘণ্টার আলাপেই একটা মানুষকে বিচার করে ফেললি?"

বলেছি যে আমার ধারণা ছিল যে নীপুদাকে আমি বুঝেছি, কিন্তু যেদিন পাঁচ বছরেব পর মেযের ঋণ শোধ করে হঠাৎ একদিন নীপুদা একটা গুরুতর অপবাদ কাঁধে নিয়ে মেস্ থেকে অন্তর্ধান হল, সেদিন সকলের চেয়ে তাকে বেশি বুঝেছিলাম বলেই স্তম্ভিতও হয়েছিলাম সকলের চেয়ে বেশি। সব চেয়ে মুশকিল হয়েছিল এই যে, এ অপবাদকে

অমূলক ভাববার কোনো সুযোগ আমার ছিল না। থাকলে মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম। কিন্তু ভেবেও কোনো কূল-কিনারা পাইনি। যে লোক পরের দায়ে ঋণ করে, পাঁচ বছর ধরে সর্বস্বান্ত হয়ে একবেলা খেয়ে সে ঋণ শোধ করে, সে লোক কেমন করে তার পরম বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে সামান্য একশোটা টাকার জন্যে?

এই বন্ধুটির নীপুদার ওপর শ্রদ্ধা আমার চেয়ে একবিন্দুও কম ছিল না এবং সেই জন্যেই নীপুদাকে পুরোনো কাজ ছাড়িয়ে নিজের বৃহৎ ইট-খোলার ম্যানেজারিতে সে অনুরোধ করে নিযুক্ত করেছিল। দু'-মাস সেখানে কাজ করার পর শুনলাম—নীপুদা একশোটা টাকা ভেঙে উধাও হয়েছে; এবং শুধু একশো টাকা সরিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ইট-খোলার সমস্ত দাদন দেওয়া কুলিকে পালাবার পরামর্শ ও সুযোগ দিয়ে বৃহৎ ব্যবসায়টির একেবারে সর্বনাশ করে গেছে। তারপর পাঁচ বছর আর নীপুদার কোনো সংবাদ পাইনি।

রোগশয্যার পাশে বসে এই সব পুরোনো কথাই ভাবি।

বিপদ ততদিনে কেটে গেছে। নীপুদা আরোগ্যের পথে, কিন্তু শরীর এখনো বড় দুর্বল। বিছানা থেকে ওঠা এখনো নিষেধ।

রুগ্ন শীর্ণ দেহটির দিকে তাকিয়ে মনে হয় সে নীপুদা আর নেই যেন। শুধু চেহারাই তার পরিবর্তন হয়নি, স্বভাবও বদলে গেছে।

একদিন ঘরে ঢুকে অপ্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, নীপুদা ডেকে বললে, "পালাসনি, এ চোখের জল পড়ল বলে আমার যত লজ্জা, তোর দেখতে পাওয়ার লজ্জা কি তার চেয়েও বেশি রে?"

নীপুদাকে কেমন করে বোঝাব—চোখের জল সবখানেই পীড়া দেয়; দুর্বলের বেলা করুণা করে না হয় স্বস্তি পাই, কিন্তু যেখানে করুণা করা ধৃষ্টতা মনে হয়, সেখানে যে চোখের জল মানুষের অসহ্য হয়ে

ওঠে। আরও ভাবি, কত বড় নিদারুণ সেই ব্যথা যা ওই ভবঘুরে অসাধারণ লোকটির চোখ থেকেও অশ্রু আনতে পারে? সে কি ব্যথা? সে কি গ্লানি? কি সে?

নীপুদা শুয়ে শুয়ে দিন রাত কি যেন ভাবে। মাঝে মাঝে ডাকে, কি একটা কথা যেন বলতে চায় মনে হয়, কিন্তু বলে না। অন্য কথা পাড়ে।

বলে হয়তো, "শক্ত অসুখের পর ইন্দ্রিয়গুলো আরও তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে, না রে?"

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে যায়, "অনেক দিন উপোসের পর দেহের মতো মনের খিদেও খুব বেড়ে যায় বোধ হয়। এত ছোট-খাট জিনিস আগে কখনো লক্ষ্য করেছি বলে মনে পড়ে না। আজকাল তাতে এত আনন্দ পাই—" একটু থেমে বলে, "পোকাটা কড়িকাঠ কুরে গর্ত করছে শুনতে পাচ্ছিস? ওই একঘেয়ে শব্দটুকুও ভালো লাগে আমার, শুনে শুনে ক্লান্তি হয় না।"

তারপরে একেবারে চুপ করে।

খানিক বাদে আবার ডাকে...

নীপুদার জ্বরটা আবার পাল্টে এল।

ডাক্তারকে বিদায় করে যখন ঘরে ফিরে এলাম, বাতির অনতিস্পষ্ট আলোতেও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন করে না জানি বুঝে নীপুদা ম্লান হেসে বললে, "তুই যেমন পাগল, ডাক্তারদের কথায় বিশ্বাস করিস—এত সহজে মরব না রে!"

তারপর বললে, "রংপুরে একটা খবর দে!"

রংপুরে পাতানো মেয়ের কাছে খবর গেল। এই কথাটাই বলতে নীপুদার এত দ্বিধা?

সকাল না হতেই নীপুদা বললে, "ঘরটা বড় নোংরা হয়ে আছে, না রে? একটু পরিষ্কার করিয়ে ফেল্ দিকি।"

আর একবার ডেকে বললে, "দেখ্ দিকি জ্বরটা বোধহয় মগ্ন হয়ে গেছে।"

দেখে বললাম, "না, হয়নি।"

খানিক বাদে আবার ডেকে বললে, "আচ্ছা, আর্শিটা নিয়ে আয় দেখি—"

বললাম, "আর্শি কি হবে নীপুদা এখন?"

অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে বললে, "সব কথাতে তর্ক করিস কেন, বল তো?"—আর্শিতে মুখ দেখে বললে, "বাঃ, এ যে খাসা চেহারা হয়েছে রে জটাগুলো কেটে!" আর্শিটা ফিরিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে বললে, "আজ আসবে লিখেছে—হয়তো নাও আসতে পারে, কি বলিস? ট্রেন ফেলও তো হতে পারে!" খানিক কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে বললে, "এত হ্যাঙ্গাম করে আসতে না বললেই ভালো হত। তোর টাকাগুলো জলের মতো খরচ হচ্ছে।"

নীপুদার এই অত্যন্ত সাধারণ দুর্বল দিকটির পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধা কমে না, বরং বেড়ে যায়।

পাতানো মেয়েই হোক আর সত্যিকারের মেয়েই হোক, নারী আসছে রোগের সংবাদ পেয়ে! সুতরাং কান্নাকাটি ইত্যাদি হবে জেনে এক রকম প্রস্তুত হয়ে ছিলাম, তবু মেসের ভেতর মেয়েছেলের কান্না-কাটিটা মেসের লোকেরা কি রকম গ্রহণ করবে ভেবে মনে একটু অস্বস্তিও ছিল। কিন্তু নীপুদার পাতানো মেয়েকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখতেও এর চেয়ে সাজ-সজ্জার দরকার হয় না। তাম্বুলরঞ্জিত অধর মৃদু হাস্যে ঈষৎ ফাঁক করে যে সুসজ্জিতা এবং সুন্দরী—মিথ্যা বলতে পারব না—মেয়েটি গাড়ি থেকে নামল,

পরমহিতৈষী গুরুজনের গুরুতর রোগের সংবাদে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসার কোনো চিহ্ন তার কোথাও নেই।

একদিন নীপুদার জামাইকে দেখে বিরূপ হয়েছিলাম, আজ তার পাতানো মেয়েকে দেখে সমস্ত গা ঘৃণায় রী রী করে উঠল। একটু কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত কি এই নির্লজ্জ মেয়েটির নেই? রোগশয্যার বেদনাকে উৎসবের বেশে অপমান করতে এল সে কি বলে? মনে পড়ল, মেয়েটাকে কালীঘাটের কুমারীদের ভেতর নীপুদা কুড়িয়ে পেয়েছিল বটে!

জোয়ান কদাকার জামাইটি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বিনিয়ে বিনিয়ে কি বলছিল শুনতেও পাইনি। এই মেয়ে-জামাইয়ের প্রতি অনুরাগের জন্যে নীপুদার ওপর পর্যন্ত রাগ হচ্ছিল।

মেয়েটি হাসিমুখে ঘরে ঢুকে বললে, "ওমা, কি বিচ্ছিরী চেহারা হয়েছে তোমার গো!"

নীপুদার মাথার কাছে গিয়ে একটু বসল, আবার তখনি উঠে আর্শিটার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, "আর্শিটা তো ভারি সুন্দর!" খোঁপাটা একবার হাত দিয়ে ঠিক করে নিলে। নীপুদার দিকে ফিরে জিগগেস করলে, "এতদিন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলে বল তো?" তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "ওমা পেছনে আবার একটা পুকুর আছে!"

চৌকাঠের কাছ থেকে ফিরে নিচে নেমে গেলাম। পায়ের শব্দে বুঝলাম জামাইও পেছনে আসছেন।

সমস্তক্ষণের মধ্যে নীপুদা একটিও কথা কয়নি। মেয়েটির লজ্জাহীনতা বুঝতে পারি, হৃদয়হীনতা বুঝতে পারি না। ভালো করে তাব সম্বন্ধে কিছু জানি না। শুধু জানি—নীপুদা একদিন কালীঘাটে গিয়ে এক-পাল দুরন্ত অসভ্য দরিদ্র কুমাবী মেয়েদেব ভেতব ঐ মেয়েটির বিশেষত্ব দেখে আকৃষ্ট হয়। নীপুদাব মুখে যা শুনেছি তাতে ধাবণা হয়, বর্তমান রূপের কিছুই তখন উপযুক্ত আবেষ্টনের অভাবে

ফুটতে পারেনি। দুর্বল ক্ষীণ দেহে লক্ষ্য করবার মতো ছিল মাত্র দুটি ডাগর উজ্জ্বল চোখ আর তার অত্যন্ত সপ্রতিভ ব্যবহার। নীপুদা বলেছিল, "ব্যবহার তার এত বেশি সপ্রতিভ যে সন্দেহ হয়, যেন কুণ্ঠা ঢাকবার জন্যে সে আর সব মেয়েকে টেক্কা দিয়ে অসভ্যতা করছে।"

আর সব মেয়ে পয়সা চেয়ে কোলাহল করেই ক্ষান্ত ছিল। এ মেয়েটি এসে একেবারে পকেটে হাত দিয়ে বসল। ধমক দিতে অন্য মেয়েগুলো হেসে সরে দাঁড়াল, এ মেয়েটি দমল না, বরং উল্টো ধমক দিয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সমস্ত মুখ তার হঠাৎ হিঙুলের মতো রাঙা হয়ে উঠল।

তারপর নীপুদা সন্ধান নিয়ে জেনেছিল, মেয়েটির বাপ নেই, তাই ভাইয়ের তথাকথিত আশ্রয়ে মেয়েটিকে নিয়ে মা থাকে। কালীঘাটের পেছনে, সুড়ঙ্গের মতো অন্ধকার আর নোংরা যে গলিগুলি শ্যাওলা আর নোনা-ধরা পুরোনো ইটের জমাট জটলার ভেতর দিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ইতস্তত গেছে, তারই একটির পাশে পায়রার খোপের মতো সঙ্কীর্ণ মুমূর্ষু দু'কুঠরী-ওয়ালা একটি কোঠা-বাড়িতে তাদের বাস। নীপুদা বলেছিল, "বাড়িটাকে দেখলেই মনে হয় যেন তার নাভিশ্বাস উঠেছে। রুয়ে-খাওয়া আলকাতরা-মাখানো বৃদ্ধ কড়িকাঠগুলো ছাদের ভারে নুয়ে পড়েছে। কয়েক জায়গায় মারাত্মক রকম ঝুলে পড়েছে ছাদের টালি। এবং সমস্ত ঘরে বদ্ধ বাতাস আর শ্যাওলার একটা ভ্যাপসা অসহ্য গন্ধ। বাড়ির বাসিন্দাগুলি কিন্তু বাড়ির হুবহু প্রতিচ্ছবি। বৃদ্ধ মামাটি হাঁপানিব ব্যয়রামি। মনে হয় যেন তার পাঁজরার খাঁজে খাঁজে নোনা ধরেছে। মা'টিকে দেখলে পাতা-ঝরা শুকনো সজনে গাছের কথা মনে পড়ে।"

তারপর নীপুদার সেখানে আলাপ করতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। মেয়েটির বাপ বেঁচে থাকতে অবস্থা তাদের নাকি খুব ভালো না হলেও

চলনসই ছিল। কিন্তু অমিতব্যয়ী বাপের মৃত্যুর পর মাথা গোঁজবার জায়গাটুকু পর্যন্ত দেনার দায়ে গেছে। মামা স্বীকার না করলেও নীপুদা বুঝতে পেরেছিল, এখন ওই মেয়েটির কালীঘাটে ভিক্ষা-করে-আনা রোজগারই তাদের সংসার চালাবার একমাত্র না হোক, প্রধান সম্বল।

এর বেশি নীপুদা কিছু আমায় কখনো জানায়নি। তবে বাইরে অন্য সূত্রে জেনেছিলাম, নীপুদা মেয়েটির ভিক্ষায় বেরোনো বন্ধ করে দেয়। অনাত্মীয়ের সাহায্য নিতে মামা ও মা যে বিশেষ সংকুচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

মেয়েটি উপযুক্ত হলে নীপুদা তার বিয়ে দিয়েছিল ও তার সংগে কন্যা-সম্বন্ধ পাতিয়েছিল—এ ছাড়া আর কিছুই এ সম্বন্ধে জানি না। জানবারই বা আর কি আছে? দুঃখ হচ্ছিল শুধু আজ এই ভেবে যে, নীপুদার জীবনের একটিমাত্র স্নেহের ক্ষুধাই এমন অপাত্রে পড়ে অপমানিত হল।

ঘণ্টা দু'এক বাদে ওষুধ খাওয়াতে ওপরে গিয়ে দেখলাম—নীপুদা গম্ভীর মুখে কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শুয়ে আছে। মেয়েটি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিল সে-ই জানে। পায়ের শব্দে ফিরে দাঁড়িয়ে মুখে যেন অত্যন্ত জোর করে হাসি টেনে মেয়েটি বললে, "কই, এই তো তোমার সুধীর এসেছে, চেনা করিয়ে দাও।"

নীপুদা মৃদু হেসে বললে, "আলাপ করবার আগেই তো তুই নাম ধরে ফেললি, আর সুধীর কি তোকে চেনে না? ওরে সুধীর, এর নাম বুড়ি, বুঝলি?"

মেয়েটি আবদারের স্বরে বললে, "না গো সুধীরদা, আমার নাম শোভা।"

নীপন্দার সঙ্গে আমিও জোর করে হাসলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন বেসনুরো। ওষন্ধ দিয়ে ফিরে আসছিলাম, শোভা ঘর থেকে পেছন পেছন বারান্দায় বেরিয়ে এসে ডাকলে, "সন্ধীরদা!"

থেমে একটন্ বিরক্ত হয়েই বললাম, "কি?"

শোভা পালটে ভ্রূকুটি করে বললে, "ওঁকে বলন্ন, আজ রাত্রে বাড়ি যাওয়া হবে না।"

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিগগেস করলাম, "তার মানে?"

"তার মানে এখানে থাকব। পারেন তো একটা বিছানা যোগাড় করে দেবেন। না পারেন, অমনিই শোব ঘরের মেঝেতে।"

কথাটা বলে শোভা ফিরে যাচ্ছিল। পেছন থেকে ডেকে বললাম, "এটা আমার বাড়ি নয়, মেস্, একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? মেসের লোকেরা ভাববে কি?"

শোভা ফিরে অত্যন্ত তীক্ষ্ন্স্বরে বললে, "মেস্ তো হয়েছে কি? এটা মানন্ষের মেস্ তো, জানোয়ারের তো নয়!"

নীপন্দার ঘরে তীক্ষ্ন কণ্ঠ পৌঁছেছিল বোধহয়। জিগগেস করলে, "কি হল বন্ড়ি?"

শোভা পলকে কণ্ঠ পরিবর্তন করে বললে, "হয়নি কিছন্—সন্ধীরদার সঙ্গে একটন্ ঝগড়া করছি।"

"বাঃ, বেশ, এক মিনিট ভাব না হতে হতেই ঝগড়া!"

"ক'মিনিটই বা আছি—এর মধ্যেই সব সেরে নিতে তো হবে।"

আর কিছন্ না বলে নিচে নেমে গেলাম।

সকালবেলা দেখলাম আর এক রন্প।

কাল রাত থেকে নীপন্দার জন্বরটা ছেড়েছে। সকালবেলাও জন্বর নেই।

শোভা বললে, "দেখলে, আমি তোমার ওষুধ, এলাম আর জ্বর ছেড়ে গেল। এইবার কিন্তু আমায় যেতে হবে—সুধীরদা, একটা গাড়ি ডাক।"

শোভা অস্থিরের মতো ঘরময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

নীপুদা বললে, "সে কি রে! আজ বিকেল পর্যন্ত অন্তত থাক।"

পায়চারি করতে করতেই শোভা মাথা নেড়ে বললে, "উহুঁ—উহুঁ।"

"কি এমন মস্ত গিন্নী হয়েছিস, একবেলা থাকতে পারিস না! আমরা কি কেউ নই?" বলে নীপুদা হাসল।

"পরের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে এখন মায়া-কান্না কাঁদলে শুনব কেন!" বলেই জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "আচ্ছা সুধীরদা, এ পুকুরটায় মাছ আছে?" তৎক্ষণাৎ আবার জানলার কাছ থেকে সরে এসে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বললে, "আচ্ছা, ঘর সাজাতে কি কি নিয়ে যাব বল তো? ওই ব্র্যাকেটটা, আর ওই ছবিটা, আর এই আয়নাটা—দেবে তো?—দেখ।"

"ও সব যে সুধীরের।"

"যারই হোক, আমার লুট করতে আসা, পেলেই হল! কই সুধীরদা, গাড়ি ডাকতে গেলে না?"

এতক্ষণের মধ্যে পলকের জন্য শোভা এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ায়নি।

বেরিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম নীপুদা বলছে, "লুট করতে আসা—হ্যাঁরে?" শোভার উত্তরটা শুনতে পেলাম না।

যাবার সময়েও অমনি অস্থিরতা! বললে, "দেখ সুধীরদা, ভালো মনে জিনিসগুলো দিচ্ছ তো? রাস্তায় যেন আবার সব ভেঙে না যায়!"

নিজেই বুঝতে পারছিলাম না কেন তার ওপব আর বিরক্তি নেই। হেসে বললাম, "আমার জিনিসগুলো আমি ভালো মনেই দিলাম। আয়নাটা নীপুদার, ওটার কথা উনি জানেন।"

এ আয়নার কথা মনে করে নীপুদা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। শোভা বললে, "আর তো কিছু লুট করবার মতো পাচ্ছি না।"

"আমায় লুট করে নিয়ে যা না—" বলে নীপুদা হাসতে লাগল।

হঠাৎ অকারণে গম্ভীর হয়ে উঠে শোভা বললে, "তুমি খুব উপহাস করতে পার, জানি।" এবং পরমুহূর্তেই হেসে বললে, "বড্ড ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে। কার সঙ্গে ঝগড়া করি বল তো সুধীরদা?"

জামাই দরজায় এসে দাঁড়িয়ে জানালে—গাড়িতে সমস্ত জিনিসপত্র তোলা হয়েছে। জামাই কাল থেকে একবারও কিন্তু ঘরে ঢোকেনি।

নীপুদার পায়ের ধুলো নিয়ে ও আমায় নমস্কার করে শোভা বললে, "আসি তা হলে!"

কিন্তু চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়েই হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "ওমা, বাপের বাড়ি থেকে যেতে গেলে কাঁদতে হয়—না?" বলেই ছুটে এসে নীপুদার খাটের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে মুখটা নীপুদার দুটো পায়ের ভেতর গুঁজে বসে পড়ল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নীপুদা যেমন ছিল তেমনি কাঠ হয়ে শুয়ে রইল।

নিঃশব্দ কান্না। মুখ দেখতে পাওয়া যায না। শুধু মনে হচ্ছিল, মেয়েটির সমস্ত দেহ কিসের আবেগে ঢেউয়ের মতো দুলে দুলে উঠছে।

পাঁচ মিনিট অমনি কাটল। হাসিমুখে যখন সে উঠল তখন তার চোখের জল মোছবার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও সিক্ত চোখেব পল্লবগুলি আষাঢ়েব আঁকাশের মতো ভার হয়ে আছে। ছোট্ট আর্শিটা তুলে নিয়ে হেসে বললে, "দেখলে, ওই জন্যে কাঁদতে চাইনি, কাঁদতে গিযে গেল আমাব খোঁপাটা নষ্ট হযে।"

কেউ কোনো উত্তব দিলে না। জামাই খবর দিযেই চলে গিযেছিল, আবার এসে নীপুদার পায়ের ধুলো নিযে বেরিযে গেল।

শোভা পেছন পেছন বেরিয়ে গেল আর কোনোদিকে না তাকিয়ে।

নীপুদা ডাক্তারের ভয়কে উপহাস করে সত্যিই সেরে উঠল। এবং এক-দিন ঝোলাঝুলি গুটিয়ে বললে, "চললাম রে!" কোথায়—জিগগেস করা বৃথা বলে জিগগেস করিনি।

যাবার আগে একদিন নীপুদা কি কথায় হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, "ইটখোলার কুলিগুলো কলেরায় সাবাড় হয়ে যাচ্ছে—তখনো ভাবছি বিশ্বাসঘাতকতা করব বন্ধুর সঙ্গে! ভাড়ার টাকা দিয়ে পালাতে না দিলে একটা প্রাণীও বাঁচে না—তখনো নিজের সঙ্গে যুঝছি—বন্ধুর টাকা চুরি করব! বাজারে মহত্ত্বের এমনি মোহ!"

খানিক থেমে ভিন্ন স্বরে বলেছিল, "উঁচু দিকে নজর রেখে উঠলেই কি পথ ভোলবার ভয় এড়ানো যায় রে? দেবতা হতে গিয়ে দেউলেও হওয়া যায় মানুষের মহিমা না বুঝে—"

অপরিস্ফুট হোক অস্পষ্ট হোক, আমি জানি—নীপুদার জীবনের এই-টুকুই টীকা।

সুরমা এবার হেসে বললে, "গড়বার সময় বিধাতা পুরুষের মধ্যে বেশি দিয়েছিলেন বোধহয় স্বপ্ন আর নারীর মধ্যে মাটি—পৃথিবীর মাটি। তোমরা যতটা স্বপ্ন দেখ অতটা আমরা পারি না। নিজেদের এ অক্ষমতা স্বীকার করেই প্রেমের পরাজয়ের একটি দিকের কথা বলছি।"



গরুর গাড়িগুলো বোঝাই হচ্ছিল। আলমারি, টেবিল, খাট, চেয়ার, আলনা, দেরাজ, সিন্দুক, তোরঙ ইত্যাদি স্তূপাকার হয়েছিল উঠোনের মাঝে। লাটু তার কচি তীক্ষ্ণ গলায় অনাবশ্যক চিৎকার করে সকলকে সাবধান করছিল, "থবি, ওখানে থবি, পা দিও না।" উনি বোধহয় ঠাট্টা করে ওকে ছবি আগলাতে বলেছিলেন।

বাড়ি বদল হচ্ছিল। আমাদের রক্তে এখনো সেই চিরচঞ্চল পূর্ব-পুরুষদের অস্থিরতা আছে নিশ্চয়ই, নইলে শান্তি ও স্থিতি আমরা যতই ভালোবাসি না, এমন দিনে এই বিশৃঙ্খলার মাঝেও মন কেন এমন খুশি হয়ে ওঠে।

প্রকাণ্ড ছ'পেয়ে তক্তপোশটা ছ'জন কুলি মাথায় করে দাঁড়িয়েছিল। সতীশ ভীষণ রেগে একটা কুলিকে ধমক দিচ্ছিল। বেচারা তার সাধের টেবিল-আর্শিটা গরুর গাড়িতে তুলতে ভেঙে ফেলেছে।

গিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে উঠলাম।

লাটু সতীশ আগে থাকতে উঠে বসে জায়গা নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে। "ঠাকুর, তাহলে তুমি এগুলো সব সঙ্গে করে নিয়ে এস—দেখ যেন কিছু পড়ে না থাকে।" উনি এসে উঠলেন। গাড়ির দরজা বন্ধ করে জানলার ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললেন, 'আট নম্বর নন্দন মিস্ত্রীর লেন, ভবানীপুর—হাঁকাও।"

গাড়ি ছেড়ে দিলে। এতকালের পরিচিত বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি—বহুদিনের বহু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের একটা আকর্ষণের বেদনা একটু অনুভব করছি বটে, কিন্তু আনন্দ হচ্ছে বেশি। বাড়িটা কোনোকালে আমাদের পয়মন্ত ছিল না। এসব কুসংস্কার মনে স্থান দিতে লজ্জা করে, কিন্তু না এনেও পারি না।

লাটু হবার আগে যে সন্ধ্যায় এ বাড়িতে এসে প্রথম উঠেছিলাম সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে। আবছা আলোয় বাড়ির চেহারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। সেই তরল অস্পষ্টতার মাঝে যেন অভ্যর্থনার কোনো আভাস ছিল না। লম্বা অন্ধকার পথটা দিয়ে একটা লণ্ঠন জেলে উনি আগে আগে যাচ্ছিলেন। বাড়িটার সামনে নোড় গাছটা অন্ধকারে দীর্ঘ অঙ্গুলির সঙ্কেতে যেন নিষেধ জানাচ্ছিল। সেইদিনই গাটা ছমছম করে, তারপর এই বাড়িতেই সুকু মারা গেল।

ওঁর ব্যবসা যে দিন ফেল হল সেইদিনই ছাদের আলসে ভেঙে সতীশ মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিল। সকলে বলত তোমাদের বাড়িটা বদল কর। উনি বলতেন যত বাজে কথা।

উনি যেদিন নিজে ভয় পেয়েছিলেন সে রাতের কথা মনে আছে। হঠাৎ মাঝরাত্রে আমায় ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন, 'দেখ কি আশ্চর্য! একটু বাইরে গিয়েছিলাম—মনে হল নোড় গাছটা প্রকাণ্ড মানুষের মতো বাইরের দেয়ালের ওপর থেকে নিচু মাথা বাড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।" তারপর নিজেই হাসতে হাসতে বললেন, 'ঘুমের ঘোরে কি দেখতে কি দেখেছি হয়তো।"

সকালবেলা উঠে দেখেছিলাম নোড় গাছের একটা ডাল কেমন করে ভেঙে বাইরের দেয়ালের ওপর দিয়ে বাড়ির ভেতর এসে নুয়ে পড়েছে। উনি খুব হেসে ছিলেন। আমি কিন্তু খুব ভয় পেয়ে জিগগেস করেছিলাম, "আচ্ছা, ঝড় বৃষ্টি নেই, ডালটা রাতারাতি এমন ভাঙলই বা কি করে?"

গাড়ি একটা ট্রাম রাস্তার উপর দিয়ে চলেছে। বিশ্রী আওয়াজ হচ্ছে একটা। উনি মুখ বার করে বললেন, "বাঁওহাতি।"

ওপাশ থেকে একটা গাড়ি আমাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষণকালের দেখার মাঝে একটি ছোট্ট সুন্দর অভিনয় দেখে নিলাম। একটি ময়লা ফ্রক-পরা ছোট মেয়ে গাড়ির জানলা থেকে বাইরে মুখ বার করবার চেষ্টা করছে আর একটি ঘোমটা-দেওয়া বৌ তাকে জোর করে ভেতরে টেনে রাখবার চেষ্টায় নাকাল হচ্ছে।

বড় রাস্তা থেকে একটা সরু গলির ভেতর ঢুকছে গাড়িটা। বাঁ পাশে একটা প্রকাণ্ড ইমারত তৈরি হচ্ছে, লাল ইটের পাহাড় জমা করা। তার পাশে ভাঙা স্থবির বাড়িটা যেন মাটিতে নুয়ে পড়ে ধুঁকছে। ছেলেরা বোধহয় মার্বেল খেলছিল, গাড়ি আসতে দেখে ধারে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সতীশ তার নতুন পাড়ার ভাবী বন্ধুদের একবার পর্যবেক্ষণ করে নিলে। আমি বললাম, "ভারি অন্ধকার তো গলিটা।"

গাড়োয়ান হেঁকে জিগগেস করলে, "কোন বাড়ি, লাগাব, বাবু?"

'ওই যে সব শেষের—"

লম্বা রোগা গোছের তেতলাটা সরু গলির ওপর বেখাপ্পা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশের সমস্ত নিচু দোতালার মাঝে এই উচ্চশির 'বাড়ন্ত' তেতলাটিকে ঠিক যেন বামনের দলে দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে। বাড়িটার আকারে সত্যি একটা বিশেষত্ব আছে। একটা কালো টিনের পাতে ইংরাজিতে আর্ট লেখা। তার ওপর কোনো শিল্পানুরাগী শিশু

আঁচড় কেটে বিহঙ্গকুলের প্রতি আপনার অনুরাগ প্রদর্শন করেছে। বাড়িটা যেন তার সমস্ত মুক্ত দরজা-জানলা দিয়ে তার এই নতুন বন্ধুদের প্রতি কৌতূহল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে।

কেন জানি না, আমার মনে হয়—মানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাসে এই ইট-কাঠের অচেতন সমষ্টির একটা নিঃশব্দ অথচ প্রবল প্রভাব আছে। শুধু ইট-কাঠের জড়স্তূপ বলে আমি এদের ভাবতেই পারি না। এক এক সময় মনে হয় এ নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু আজ এই দীর্ঘ তেতলাটি তার মুক্ত দ্বার ও বাতায়নের কৌতূহল-দৃষ্টি দিয়ে আমায় যে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিলে, সে কথা আমি অস্বীকার করি কি করে?

সতীশ ও লাটু গাড়ি থামতে না থামতেই নাচতে নাচতে নামল। সদব দরজায় একটা তালা দেওয়া। উনি চাবি দিয়ে খুললেন। ঘরের হালকা সবুজ রঙে বাইরের খর আলো স্নিগ্ধ হযে এসেছে। আমাদের সে বাড়ির সমস্ত ঘরেই রঙ ছিল গাঢ় হলদে। এটা বাইবের ঘব, দেযালে কোনো কাজ নেই—শুধু মেঝের কিছু ওপব দিযে কালো আর জরদা রঙের দুটি মোটা লাইন ঘরময ঘুবিযে টানা। বেশ লাগছে। বাঁপাশের চওড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপবে উঠছি। সিঁডিব বেলিঙেব হাতলে সেই শিল্পীরই আঁকা এক-একটি পাখি মাঝে মাঝে। কাবা এ বাড়িতে ছিল জানতে ইচ্ছা হচ্ছে।

দোতলায় তিনটি ঘব। প্রথম ঘরে ঢুকলাম। ফিকে নীল বঙ—তেমনি তলায় রঙের পাড়, এবারে জবদা ও হলুদ। পাডের নিচে থেকে দেযালের বঙ আর একটু ঘোরাল হযে এসেছে। দ্বিতীয ঘব—শাদা-সিধে কলি ফেরানো। তৃতীয ঘব বোধহয় তাড়াতাড়িতে ভালো কবে পরিষ্কার করা এখনো হয়ে ওঠেনি। অর্ধেকটায় কলি ফেরানো। একটা

চুনমাখা টিন, পাটের ন্যাতা পড়ে আছে এক কোণে। আর এক কোণে এক রাশ ছেঁড়া কাগজ—ট্যাক্সের বিল, ছেঁড়া পোস্টকার্ড, খাম, রাস্তার হ্যাণ্ডবিল, ধোপার বাড়ির রসিদ ইত্যাদি ইত্যাদি। লাটু আর সতীশ ঘাঁটছিল। উনি বকলেন। লাটু ও সতীশের একটা গোলাপী খামের সত্ব নিয়ে ঝগড়া বেধেছে।

তেতলায় মাত্র একটি প্রকাণ্ড ঘর, দক্ষিণের জানালা থেকে দূরে ধূমায়মান ক'টা কলের চিমনি দেখতে পাচ্ছি—বিরাট ধূপদানি থেকে আকাশের পানে ধূমের স্তুতি উঠছে মনে করতে পারতাম যদি ওই কালো ধূমের মেঘে আকাশকে অমন বিষণ্ণ না দেখাত। ডাইনে বাঁয়ে চারিধারে, গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি হাজার হাজার বাড়ি। ইট-পাথর কাঠের জটিল অরণ্য—মানুষের মধুচক্র। এমনি করে এই জড় মৃত্তিকাস্তূপের বিশৃঙ্খলার মাধুর্য উপভোগ করতে আমার ভারি ভালো লাগে। এই নগরের ছন্দহীন বিপুলতার মাঝে মানুষের মনের একটা রূপ ও রূপক এক সঙ্গে আমি দেখতে পাই, মানুষের মনের মতো—যেমন জটিল তেমনই অপরূপ, একধারে দুর্বল আর একধারে শক্তিমান। আর সব চেয়ে মানুষের মনের সঙ্গে মিলন তার এইখানে—সে আজও নিজের অর্থ খুঁজে পায়নি, এমন কি লক্ষ্যও না। আপনাকে সে চেনে না।

উনি হঠাৎ চমকে দিয়ে বললেন, "ছাদে উঠে তন্ময় হয়ে থাকলেই কি চলবে, নিচে নামতে হবে না?"

সতীশ হঠাৎ দৌড়ে এসে আমার হাতে একটা গোলাপী খাম গুঁজে দিয়ে বললে, "দেখ তো বৌদি, লাটু এটা নিয়ে কি করবে? আচ্ছা তুই পড়তে পারিস—না, তুমি ওকে এটা দিতে পারবে না, বৌদি, কিছুতেই না।" ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়—একটা সামান্য নিমন্ত্রণের চিঠি। একটা রঙিন খামের ভেতর একটি সুন্দর কার্ডে লেখা : "আগামী...শ্রীমতী গায়েত্রী মিত্রের—শ্রীমান বরেন্দ্র সরকার" ইত্যাদি। খামের ওপর কোনো ঠিকানা নেই। লাটু চিৎকার করে বলছে, "আমি

পেয়েছি!" উনি আমার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পকেটে রেখে বললেন, থাক, কেউ পাবে না, ওটা আমার।" উপায় নেই দেখে দুজনে চুপ করল।

নিচে নামছি। সিঁড়ির দেয়ালে চুনকাম করা হয়নি। চারদিকে হিজি-বিজি কাটা আর ছবি আঁকা—পাখি, হাতি, সাপ ইত্যাদি, অবশ্য এখানেও বিহঙ্গকুলের প্রতি চিত্রকরের পক্ষপাত পরিস্ফুট। সিঁড়ির একটি বাঁকের মাথায় বাঁকা বাঁকা আক্ষরে লেখা : "দিদির বিয়ে হবে নলিন দাদার সঙ্গে।"

উনি অনেকখানি নিচে নেমে গিয়েছিলেন। থেমে জিগগেস করলেন, "দাঁড়ালে কেন আবার?" বললাম, "যাচ্ছি, এইগুলো পড়ে যাই।" পাশেই লেখা : শ্রীগায়ত্রী দেবী—শ্রীনির্মল মিত্র, শ্রীবিমল মিত্র, তারপর 'আমি'। এই সব পর পর।

দোতলার প্রথম ঘরটায় আজ শোবার বন্দোবস্ত হচ্ছে মেঝেয় বিছানা করে। গরুর গাড়ি তিনটে এসে পড়েছে—লাটু চেঁচাচ্ছে—সতীশ হুকুম দিচ্ছে—কুলিরা হট্টগোল করছে, নিচে মাল এসে জমছে, এলোমেলোভাবে দোতলায়ও কিছু এসে পোঁছেছে। কোথাও কোনো শৃঙ্খলা নেই। নতুন কলি দেওয়া ঘরের গন্ধ পাচ্ছি।

উনি বলছেন আজ আর রাঁধতে হবে না। আমি রাঁধতে চাইছি। উনি বলছেন আজ জিনিসপত্র গুছোতেই হয়রান হয়ে যাবে, দরকার নেই আর হ্যাঙ্গামে। ওঁর কথাই রইল—আজ খাবার-দাবাব আনিয়ে কাটানো যাবে। নিত্যনিয়মিত ব্যবস্থার এই ব্যতিক্রমে লাটু আর সতীশের নিয়মবিমুখ মন ভারি খুশি হয়েছে।

বুড়ো হিন্দুস্থানী লোকটির কাজে উৎসাহ আর ক্ষিপ্রতা ভারি সুন্দর লাগছে। ওর পাকা চুল আর টাক মাথা যেন ওর সবল সতেজ দেহে

ভুল করে এসে—নিজেদের অসংগতিতে লজ্জিত হয়ে পড়েছে। কাজ করতে করতে আমাদের সঙ্গে ওর আত্মীয়তা-স্থাপনের চেষ্টাটাও ভারি উপভোগ্য।

লাটু জিগগেস করলে, "তোল্ নাম কিলে বলো।"

"আমার নাম রঘু মহাতো আছে, বাবু," বলে সে হাসতে লাগল। "হামি তো নগিচেই থাকি, বাবু—তুম্হার নাম কি আছে—দাদাবাবু।"

"যাঃ!" বলে লাটু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। রঘু একটা ভারি আলনা অবলীলায় বয়ে এনে এক কোণে রেখে ওঁকে জিগগেস করলে, "এ বাড়ি কতয় ভাড়া হল, বাবু?"

"আশী টাকা।"

ময়লা গামছা দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে রঘু বললে, "সস্তায় পাইয়ে গেলেন। বাড়ি বড় উমদা আছে, হামিই তো ইয়েব সব জানলা দরজা লাগায়ে দিলাম।"

"তুমি আবার ছুতোর মিস্ত্রির কাজ জানো নাকি!"

"জানি না! হামি ছুতোর মিস্ত্রির ভি কাম জানি, রাজকে ভি কাজ জানি, বাঙলা মুলুকে বিশ বরিষ আছি বাবু, যখন যা ভগওয়ান জুটিয়ে দিলে ওহি করছি।"

একটা প্রকাণ্ড তক্তপোশ কজনে মিলে ধরে নিয়ে এল। রঘু মহাতো আবার আরম্ভ করলে, "এ বাড়ি তো মতিবাবুব আছে। ভারি আচ্ছা আদ্মী আছে, মতিবাবু। বড়া লেড়কি সব মরিয়ে গেল তব্ তো এ বাড়ি ছোড়িয়ে দিলে মনের দুঃখে।" জিনিসপত্র সব আনা হয়ে গিয়েছিল। পয়সা নিয়ে যেতে যেতে রঘু বললে, "হামি নগিচেই থাকি, যখন দরকার হোবে ডাক দিবেন। মতিবাবুর কাম তো হামি হামেশাই করতাম।"

যাক, এখনকার মতো কাজ শেষ। যা গুছোতে-টুছোতে হবে কাল থেকে করা যাবে।

বারান্দা দিয়ে পাশের ঘরে যাচ্ছি দেখি পাশের বাড়ির জানলা থেকে একটি বৌ তাকিয়ে আছে। একটু ইতস্তত করে জিগগেস করলেন, "আপনারা কি এই বাড়ি কিনলেন?"

আমি হেসে বললাম, "না, ভাড়া নিয়েছি।"

তিনি বললেন, "ওঃ, আমরা কিন্তু ভেবেছিলাম মতিবাবুরা আর বোধ-হয় এ বাড়ি রাখবেন না—বেচেই ফেলবেন একেবারে।"

একটু কৌতূহল হল, জিগগেস করলাম, "কেন? বাড়ির কি কিছু দোষ আছে নাকি?"

তিনি বললেন, "না, দোষ কি! তবে মতিবাবুর বড় মেয়েটি এখানে অমন করে মারা যাওয়ায় তাঁরা যে রকম পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন—এ বাড়ির নাম পর্যন্ত শুনতে পারতেন না, তাতে আমরা ভেবেছিলাম এ বাড়ি তাঁরা আর রাখবেন না।"

অত্যন্ত উৎসুক হয়ে জিগগেস করলাম, "কি, হয়েছিল কি?"

"জানেন না আপনারা?"

"না, কিছু শুনিনি তো!"

"সেকি, খবরের কাগজেও পড়েননি! বিয়ের রাতে মতিবাবুব বড় মেয়ে বিষ খেয়ে মারা গিয়েছিল!"

"কেন?"

"কেন, কেউ ঠিক করে বলতে পারে না। তবে শুনেছিলাম, 'নলিনী' বলে কে একটি ছেলে ওঁদের বাড়িতে ছেলেবেলা থেকে আসত, ওঁদেব কি রকম নিকট সম্পর্কের জ্ঞাতি হত। ছেলেবেলা নাকি ঠাট্টা করে দুজনের বিয়ের কথা অনেকবার পাড়া হয়েছে। শেষকালে আর একটি ছেলের সঙ্গে যখন বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল, তখন দুজনেই লুকিযে লুকিয়ে আফিঙ খাওয়ার কথা ঠিক কবে। রাত্রে বিযের লগ্ন হয়ে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ কনেকে নিয়ে সেকি ভয়ানক কান্ড! মতিবাবু তো আর ডাক্তার আনতে বাকি রাখেননি—আব আমাদেব পাশেই তো

অত বড় ডাক্তার—যামিনীবাবু রয়েছেন। সারা রাত অনেক চেষ্টাই হল, কিন্তু কোনো ফল হল না।”

“খিদে পেয়েছে মা” বলে লাটু পেছন থেকে আঁচল ধরে টানছিল। বৌটি জিগগেস করলেন, “আপনার ছেলে না?”

কোনোমতে “হ্যাঁ, ভাই, আসি তাহলে” বলে চলে এলাম।

রাত্রে বিছানায় ঘুম আসছিল না। ওঁকে সমস্ত কথা বলে বললাম, “তুমি একবার ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়ে সমস্ত কথা জানো না গো— আমার ভারি মন খারাপ হয়ে রয়েছে।”

উনি বললেন, “যামিনী নিজেই কাল সকালবেলা আসবে'খন। ও তো আমার ক্লাশফ্রেন্ড ছিল কলেজে। তখন জিগগেস করব।”

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। ডাক্তারবাবু বলছিলেন, “আমি তো সব জানি না। প্রথমটা কেউই কিছু জানত না। তারপর মেয়েটির নিজের মুখে কিছু শুনেছিলাম, আর কিছু মতিবাবুর বাড়ি থেকে জেনেছিলাম। নলিনী বলে ছেলেটি ছোটবেলা থেকেই এখানে আসত। খুব চেনাশুনা ছিল। ছোট ভাইগুলো পর্যন্ত ওদের দুজনকে ঠাট্টা করত; কিন্তু মতিবাবুদের নাকি কোনোদিন সে রকম ইচ্ছা ছিল না। নলিনী তাঁদের জ্ঞাতির ছেলে, ছেলেবেলা থেকেই আসে যায়, সুতরাং তার আসা যাওযাতে দোষ ধরবার মতো কিছু তাঁরা পাননি। ভেতর ভেতর তাদের কিন্তু প্রতিজ্ঞা হয়ে গেছে—এই জোর করে দেওয়া বিয়ে তারা কিছুতেই হতে দেবে না। বিয়ের রাত্রে দুজনে একসঙ্গে আফিঙ খেয়ে মরে ভালো করে জুলুমের প্রতিশোধ দিয়ে যাবে।”

উনি জিগগেস করলেন, “কিন্তু এত বড় মরবার প্রতিজ্ঞা করার আগে

তারা একবার ভালো করে চেষ্টা করে দেখলে না—বিয়ে হতে পারে কিনা?"

"তা নাকি করেছিল, কিন্তু একে সম্বন্ধে বাধে, তায় নলিনী একেবারে গরীব, সকলে সে কথা তাই হেসে উড়িয়ে দেয়। বিয়ের রাতে, লগ্ন কাছাকাছি—কনের খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল কনে পিঁড়ির ওপর লতিয়ে পড়েছে। নিমন্ত্রণ খেতে এসে ডাক্তারী করতে হল। চেষ্টার তো ত্রুটি হয়নি, মতিবাবু পয়সার মায়াও করেননি। আমি তো সমস্ত রাতই ছিলাম। সত্যি সে রাত্রের কথা মনে পড়লে এখনো বুক কেঁপে ওঠে। এক পলকে বিয়ে-বাড়ির সব আনন্দের কোলাহল আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেল। মরা দেখে দেখে বুকটা পাথর হয়ে গেছে, কিন্তু অত বড় ধাক্কা কখনো পাইনি। তখন তো জানতে পারলাম, সেদিন বিকেলবেলা নলিনী চার ভরি আফিঙ এনে গায়ত্রীকে অর্ধেক দিয়ে, নিজে অর্ধেক নিয়ে বাড়ি চলে গেছে।"

ডাক্তারবাবু একটু থেমে বললেন, "ওঃ, শেষকালটায় মেয়েটার কি কাকুতি! একটু যখন জ্ঞান হল সে কি কাতর মিনতি : 'বাবা, আমার বড্ড বাঁচতে ইচ্ছে করছে, তুমি যেখানে বিয়ে দেবে দাও, আমি তোমার কথার একটুও অবাধ্য হব না, বাবা, আমায় বাঁচাও। ডাক্তারবাবু, আর এমন ভুল করব না, আমায় বাঁচান।' তবু বাঁচাতে পারলাম না ভাই।'

উনি জিগগেস করলেন, "নলিনীও সেই রাত্রে মারা গেল?"

ডাক্তারবাবু একটু ম্লান হেসে বললেন, "না, খেতে গিয়েও সে রাত্রে ভয়ে সে খেতে পারেনি।"

উনি উত্তেজিত হয়ে জিগগেস করলেন, "মেয়েটাকে মেরে সে বেঁচে রইল?"

"না, দুদিন বাদে সেও ওই আফিঙ খেয়ে মারা যায়।"

উনি ভেতরে এলে বললাম, "ওগো, এ বাড়িতে আমি আর কিছুতেই থাকতে পারব না, তুমি অন্য বাড়ি দেখ।"

উনি বললেন, "পাগল হয়েছ, আমরা কি বেদে!"

কিন্তু সমস্ত বিশৃঙ্খল ঘরগুলোর ভেতর দিয়ে মৃত্যু-পরীক্ষায় পরাজিত দুর্বল ভীরু প্রেমের অসহ্য আকুল নিরুপায় কান্না ফুকরে উঠছিল : "ওগো, আমি বাঁচতে চাই যে—"

সুরমার গল্পের শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নীরদ বললে, "আপনাদের সকলের গল্পই হয়েছে অসাধারণের গল্প, সাধারণ মানুষের প্রেমের কাহিনী এগুলি নয়। সাধারণ মানুষ প্রেমের এ তীব্রতাকে ভয়ই করে। জীবনকে একটি অপূর্ব নিমেষের মধ্যে তারা উপলব্ধি করতে চায় না, তারা প্রতিদিনটিকে মধুর করে পেতে চায় এবং তাও তীব্রভাবে নয়। এই সাধারণ মানুষের কাহিনীই আমি বলতে চাই।"



আলনার পাশে ঘরের কোণে সযত্নে রাখা ভাঙা বেতের পুরোনো দোলনাটি। দেয়ালের ব্র্যাকেটে কাটিতে আটকানো অর্ধ-সমাপ্ত সবুজ পশমের ছোট্ট একটি মোজা। আর এক দেয়ালে টাঙানো সস্তা দুটি জাপানী চিক।

ক'টি ফোঁটা অশ্রু, ভীরু একটু আশা আর একটুখানি স্বপ্ন—এই নিয়ে বোধহয় মানুষের নীড়। অন্তত রবির তাই।

ওই ছোট্ট নীড়টুকুর ভেতর তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বেশ কুলোয়; এই সংসারটুকুকে ঘিরে তার জীবন লতিয়ে ওঠে, বিকশিত হয়, কখনো বা শুকিয়ে মরে।

বিলিতি ক্যালেন্ডারের বিম্বফলোষ্ঠী মেমের ছবির ওপর, দুটি জানলা পার হয়ে এসে একটি সঙ্কুচিত প্রথম আলোর রেখা পড়লে তার প্রভাত হয়। সেই আলোর রেখা ধীরে ধীরে সরে, তারপর কোন সময় অতি সন্তর্পণে ভাঁড়ার ঘরের জানলার চৌকাঠ পেরিয়ে অন্তর্ধান

হয়। তার সন্ধ্যা ঘনায় কেরাসিন কাঠের ছোট্ট টেবিলের ওপর হ্যারিকেন লণ্ঠনের অনতি উজ্জ্বল আলোর চারিপাশে।

বাতাস না থাকলে কয়লার উনুন ধরানোর ধোঁয়া পথ না পেয়ে ঘরে এসে ঢোকে। রান্নাঘরের দিকে হেঁকে রবি হয়তো বলে, "উনুন ধরিয়ে ভাঁড়ার ঘরের দরজাটা একটু ভেজিয়ে দেওয়া যায় না! এই ধোঁয়ার মধ্যে ঘরের ভেতর বসে থাকতে পারে মানুষ!"

যে উনুন ধরিয়েছে তার উত্তর দিতে নেই। তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে একটু হেসে মুখ ভেংচে চলে যায়, হয়তো চাপা গলায় বলে যায়, "একটু ধোঁয়া আর সহ্য হয় না, আমরা যে রাতদিন ওই ধোঁয়ার মধ্যেই আছি!"

কলতলা থেকে দিদি ডেকে বলে, "সন্ধ্যেবেলা ঘরের ভেতর কুনোর মতো বসেই বা আছিস কেন, একটু হাওয়ায় বেড়িয়ে আয় না!"

"হ্যাঁ, হাওয়ায় বেড়িয়ে আসব! চৌকাঠ পেরুলেই গড়ের মাঠ কিনা!" হেসে জবাব দিয়ে রবি আবার টেবিলের ওপর ঝুঁকে বই পড়া শুরু করে।

লতা কোন ছুতোয় ঘরে ঢোকে। পেছন থেকে কাঁধটা একবার নেড়ে দিয়ে চাপা গলায় কৃত্রিম রাগের স্বরে ধমক দিয়ে বলে, "যাও না, একটু বেড়িয়ে এস! অফিস থেকে এসে শুধু বই আর বই!"

চেয়ারটা ঘুরিয়ে রবি খপ করে লতার পলাতক শাড়ির আঁচলটা ধরে ফেলে। কিন্তু কথা কওয়া আর হয় না, পায়ের শব্দে চট করে ফিরে আঁচল ছেড়ে দিয়ে রবি নিবিষ্টভাবে বইয়ের পাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে, লতা ঘোমটা টেনে ক্ষিপ্রপদে বেরিয়ে যায়।

দিদি ঘরে ঢুকে ঈষৎ হেসে বলেন, "তোকে যা আনতে বলেছিলাম, এনেছিস!"

বইয়ের ওপর থেকে মুখ না তুলেই রবি বলে, "ওসব বাপু, আমার মনে থাকে না!"

"হ্যাঁ, মনে থাকে না, না আর কিছু! ও তোর চালাকি! বৌটা যে না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে গেল!"

"কেন আমাদের বাড়ি কি ভাত-ডাল জোটে না!" বলে রবি লুকিয়ে একটু হাসে।

দিদি এবার হেসে ওঠেন, বলেন, "তুই আর হাসাসনি বাপু! ভাত-ডালের কথা হচ্ছে? অরুচিতে যে কিছু খেতে চায় না!"

রবি চুপ করে থাকে।

দিদি এবার বলেন, "তোর নিজের আনতে লজ্জা হয়—টাকা দিয়ে যাস বাপু, আমিই না হয় আনিয়ে নেব।"

"তাই নিয়ো বাপু! যত সব ফেসাদ!"

"তাই তো!" বলে দিদি হেসে বেরিয়ে যান।

লতা আর একবার কোন ছুতোয় ঘরে এসে পেছন থেকে চিমটি কেটে বলে যায়, "তুমি ভারি অসভ্য!"

রবি মুখ ফেরাবার আগেই সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়!

বাঁধা গতের মতো জীবন সেই অতি-পরিচিত পথে অতি-অন্তরঙ্গ ক'টি পর্দা নিয়েই ফিরে ফিরে আনাগোনা করে। নির্দিষ্ট সীমাটুকুর বাইরে সে পা বাড়ায় না, এই অতি-চেনাব পর্দা একটুখানি সরিয়ে একবার উঁকি মারবার কল্পনাও তার নেই। তার পৃথিবী ওই নীড়টুকুর মাঝেই অতি নিকটে এসে চিরপরিচিত হযে তাকে ধবা দেয়। সে পৃথিবীর দিগন্তে অজানিত সুদূরে ধু-ধু করে না, তার প্রান্তে অতর্কিত বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে না। সে পৃথিবী রান্নাঘরের রোয়াক পেরিয়ে শীর্ণ আঙিনাতে এসে হাত-পা খেলায। সে পৃথিবী সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে সাহেব-সদাগরের আপিস হয়ে আবার ঘুরে আসে।

এই পৃথিবীটুকুর জন্যেই সে তৈবি হয়েছে। একান্ত নিজস্ব করে এই পৃথিবীটুকু তাকে পাওয়ার জন্যে কতকাল হতে কত আযোজন, কত

সাধনা। শিশুকাল থেকে যেন সে এরই জন্যে কামনা করে এসেছে। এই কামনা করতেই শুধু সে জানে।

ছেলেবেলা কাঁদলে পিসিমা সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়েছে, "বড় হলে রাঙাবৌ এনে দেব।" সে রাঙাবৌ বারবার অলক্ষিত চরণে এসে তার কৈশোর-স্বপ্নকে রঞ্জিত করে গেছে।

পড়তে না চাইলে দিদি ভয় দেখিয়েছে, "লেখাপড়া না শিখলে বিয়ে হবে না—"

আলমারির চিনে মাটির পুতুল দেখিয়ে মা বলেছেন, "তোর ছেলে হলে খেলা করবে।"

অপরাধ করলে বাবা বিরক্ত হয়ে মাকে বলেছেন, "তোমার ও ছেলের কিছু হবে না; ওটা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াবে।"

এই নিরাপদ নীড় নির্মাণেই জীবনের চরম সার্থকতা এ-কথা তাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হয়েছে। তার কৈশোর-যৌবনের সমস্ত কল্পনা সেই রাঙাবৌয়ের অদৃশ্য অঞ্চলের আঘাতেই আলোড়িত হয়েছে। তাই সত্যিকারের শুভদৃষ্টির ক্ষণে সেই রাঙাবৌ সঙ্কুচিতা, আনত আঁখি কালো মেয়ের ছদ্মবেশে দেখা দিলেও তার চিনতে দেরি হয়নি।

তারপর এমনি করে দিন যায়—অন্তরঙ্গ পরিচিত দিনগুলি। অত বেশি চেনা বলেই তারা যেন অত বেশি প্রিয়। হয়তো কোন অজানিত দেশে মহা-প্রলয়ের উন্মত্ত লীলার মাঝে রক্তাক্ত নিশাবসান হয়। কিন্তু তাদের দিন আসে যায় শান্ত মৃদু চরণে গৃহলক্ষ্মীটির মতো। তার চরণধ্বনিতে সেই পুরাতন পরিচিত সুরটিই ফিরে ফিরে বাজে, পুনরাবৃত্তির পরম মাধুর্যে সব কিছু সে পূর্ণ করে যায়। তার বেশ বদলায়, রূপ তার একই থাকে।

জীবনের অনেক রকম ব্যাখ্যা হয়তো আছে, অনেক সুরেই তাকে বাজানো যায়, কত মানবের ভাষায় তার কত অনুবাদ! কিন্তু তারা এই

একটি অর্থকেই ধরে রাখে, এই একটি বহু পুরাতন ছন্দে তাকে বেঁধে রাখে, সংসারের ছন্দ, সীমাহীন আকাশের অরূপ দেবতাকে একটি প্রিয় নামে ডাকার ছন্দ—পৃথিবীকে আঙিনা করার ছন্দ। দেয়াল দিয়ে ঘিরে ছাদ দিয়ে ঢাকলে জীবনের আকাশ তার অর্থ হারায় কি না সে প্রশ্ন করবার কল্পনাও তাদের মনে ওঠে না।

তাদের ছাদের উপর দিয়ে আকাশের উচ্ছৃঙ্খল বায়ু গর্জে যায়, তারা নিজেদের ছন্দে তার উত্তর দেয়।

দিদি বলেন, "পশ্চিমের জানলাটা বন্ধ করনি বৌ, যাঃ, রবির বই-খাতা ভিজে গেল, সে রেগে অনথ করবে।"

লতা বলে, "দিয়েছিলাম তো।"

"তাহলে বোধহয় ছিটকিনিটা ভেঙে গেছে, যাও যাও, শিগগির যাও, বড় ট্রাঙ্কটা জানলায় না হয় ঠেকা দিয়ে এস। কবে থেকে বলছি, ছিটকিনিটা খারাপ হয়েছে, তা ওর কি গা আছে, খালি বই আর বই।"

আপাদমস্তক ভিজে, কাপড়ের জল নেংড়াতে নেংড়াতে রবি বাড়িতে ঢোকে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে একটু হাসে, দিদি বলেন, "ভিজে এলি তো! কত দিন বলেছি ছাতি না নিয়ে বেরুসনি রবি, তা তোরা কি কথা শুনিস? ছাতি নিলে তোদের যে অপমান হয়।"

লতা শুকনো কাপড় গামছা এগিয়ে দেয়।

দিদি বকে যান, "আর ঝড়-বৃষ্টি দেখলে মানুষের কি কোথাও দাঁড়াতে নেই? বৃষ্টিটা থামলেই না হয় আসতিস।"

গামছা দিয়ে গা মুছতে মুছতে রবি বলে, "একটু ভিজলে আর কি হয়—বেশ তো মজা! ঘামাচি মরে যাবে।"

শুকনো কাপড়টা সে পরতে যায়; দিদি রেগে বলেন, "ওই তোর গা মোছা হল! মাথায় যে একমাথা জল। মাথা মোছ ভালো করে আগে!"

রবি হেসে মাথার লম্বা চুলগুলোতে একবার গামছা সজোরে ঘষে বলে, "নাও, হল তো!"

"না, হল না। আর একটা শুকনো গামছা নিয়ে এস তো বৌ, মাথায় অতখানি জল বসলে অসুখ করবে না?"

বাইরে উন্মত্ত বাতাস সমস্ত বাড়িটিকে ঘিরে তুমুল কলরব করে। পৃথিবীর কোন কূল থেকে কোন কূলে চলে বিপুল মেঘের সমারোহ। নীড়ের ভাষায় তারা আকাশের উত্তর দেয়। সে নীড় শুধু ছাদ দিয়ে ঢাকা, দেয়াল দিয়ে ঘেরা নয়—সে নীড় সৃষ্টিকে দেখবার একটি বিশেষ দৃষ্টি, জীবনকে অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করবার একটি বিশেষ ভঙ্গি।

কিন্তু বিধাতা বোধহয় পরিহাসের লোভ সংবরণ করতে পারেন না।

দুদিনের জ্বর বিকারে হঠাৎ লতাকে হারিয়ে রবি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কোনো তীক্ষ্ন শাণিত অস্ত্রে কে যেন তার একটা প্রধান অঙ্গ পরিপাটি করে হঠাৎ কেটে বাদ দিয়েছে। সে অঙ্গ যে তাব নেই এ উপলব্ধিই তার হতে চায় না, শুধু আঘাতের প্রচণ্ড বেদনাটি বিমূঢ় মনের মধ্যে সঞ্চরণ করে কি প্রশ্ন করে ফেরে যেন।

ছ'বৎসরের যে পরিচিত, ছ'বৎসব যে জীবনের প্রতিমুহূর্তের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিল, দু'দিনের পবে তাব কোনো চিহ্ন মেলে না। রবির ঘনমেঘাচ্ছন্ন মনের আকাশে কোথা থেকে অকস্মাৎ বেদনা গুমরে গুমরে ওঠে, সে বুঝতে পারে না। হঠাৎ বিদ্যুৎববণের মতো তীব্র বেদনার আলোকে সে এই নিদারুণ সর্বনাশ ক্ষণিকের জন্য উপলব্ধি কবে মাত্র, তাবপব আবাব সমস্ত অন্ধকার হয়ে আসে।

আগের দিন একটু ঝগড়া হয়েছিল। সামান্য ঝগড়া—অমন তাদেব অনেক হয়েছে। লতা বলেছিল, "তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না! যাও!"

"বেশ, বেশ," বলে রবি পাশ ফিবে শুয়েছিল।

তারপর রবি একবার ভাব করবার চেষ্টা করে। লতা তার হাতটাকে

জোর করে ঠেলে দিয়ে বিছানা থেকে উঠে গিয়েছিল। চুড়ির কোণ লেগে রবির হাতটা একটু কেটে যায়।

"দেখ তো, হাতটা কেটে দিলে তো!"

"কই দেখি!" বলে লতা এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু রবি তাকে ঠেলে দিয়ে বলেছিল, "যাও, দেখতে হবে না!" লতা অভিমানে মেঝেতে গিয়ে চুপ করে সেই যে বসেছিল সারা রাত আর ওঠেনি।

পরদিন সকালেই একেবারে বিকারের প্রলাপ আরম্ভ হয়। তারপর দুটি দিন মাত্র। লতার একবার জ্ঞান পর্যন্ত হয়নি। রবি একবার একটু ক্ষমা ভিক্ষা করবার অবসরও পায়নি। কোন নির্মম দেবতা দুজনের ছ'বৎসরের নিবিড় পরিচয়ের মাঝে দুর্ভেদ্য আড়াল সৃষ্টি করে রবিকে উপহাস করলেন। নীড়ের যে ছন্দ মানুষ কত কালের সাধনায় সার্থক করতে চায়, তার প্রতি মৃত্যুর কোনো মমতা নেই।

পুরাতন নীড় তেমনই থাকে। পুরাতন অভ্যাসগুলি সহজে মরে না। ক্যালেন্ডারের বিম্বফলোষ্ঠী মেমের ছবির ওপর আলো পড়ে, তেমনি প্রভাত হয়। তেমনি সন্ধ্যা ঘনায়, কেরাসিন কাঠের ছোট্ট টেবিলের ওপর হ্যারিকেনের আলোর চারি পাশে।

দিদি যেন কথা কইতে ভুলে গিয়েছেন। সারাদিনে ভাইবোনের মধ্যে দুটি একটি কথার বিনিময় হয় মাত্র। জীবনের বাঁধা গৎ তেমনিই অতিপরিচিত সুরের পথে আনাগোনা করে, কিন্তু যেন পঙ্গুর মতো, বেসুরো।

আপিস থেকে তাড়াতাড়ি আর রবি বাড়ি ফেরে না। উন্মনাভাবে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অনেক রাত্রে এসে শুয়ে পড়ে। দিদি কিছুই বলেন না। প্রতিবেশিনীরা তাঁকে উপদেশ দেয়, "কতই বা ওর বয়স, বৌ মরে গেল বলে কি আর বৈরাগী হয়ে থাকতে হবে? ভালো দেখে

আর একটি বৌ করে দাও।" দিদির কিন্তু কোনো আগ্রহ দেখা যায় না।

রবি আপিসে গেলে শূন্য ঘর-দোর খাঁ-খাঁ করে। আকাশকে দেয়াল দিয়ে ঘিরে, ছাদ দিয়ে ঢেকেও যেন যথেষ্ট ছোট করা যায়নি—বিপুল শূন্যতা ক্রমে বেড়েই চলে।

দিদির শেষে অসহ্য হয়ে ওঠে। বলেন, "পাড়ার কজন বদরিকা যাচ্ছে, যাব রে?" রবি বাধা দেয় না।

দিদি যাবার সময় অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বলে যান, "তোব কিছু অসুবিধা হবে না তো? আমি খুব শিগগিব ফিরে আসব। তোব ঘব-দোর ঝাঁট-পাট, কাপড় কাচা, বাসন মাজা—লছমী সব করবে। আব বামুনঠাকুবকেও বলে গেলাম।" তারপর মুখ ফিরিয়ে বলেন, "একটু সময়ে খাসদাস।"

তারপর ঘর একেবারে শূন্য। রবি নিজের বেদনা বিশ্লেষণ করতে পাবে না, চায়ও না। শুধু এইটুকু সে বোঝে যে, অভাব তার শুধু লতাব নয়, লতার সঙ্গে জড়িয়ে সংসারের যে সুবটুকু ছিল সেই সুরটুকুব জন্যে তার সমস্ত প্রাণ তৃষিত হযে আছে। লতার চেযেও সেই সুবেব অভাব যেন তার বেশি করে বাজে।

দিদি কিন্তু এক মাসের মধ্যেই ফিরে এলেন। বললেন, "দূর! বদরিকা সে কতদূর, আর কি হাঁটবার ক্ষমতা আছে? অনেক দিন শ্বশুরবাড়ি যাইনি, ভিটে মাটি সব উচ্ছন্নে গেছে, একবার দেখে এলাম। আর এই হতভাগী কিছুতেই ছাড়লে না, তা বললাম, 'চল্, আমাব সঙ্গেই না হয় থাকবি।'"

হতভাগী পিছনে শাদা থানে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে দাঁড়িযেছিল। মাথার কাপড় একটু সরিযে রবিব দিকে একবার তাকিযেই চোখ নামাল। হতভাগীটি দিদির দেওরঝি, নাম কমল।

দিদি বলেন, "শ্বশুর-কুল বাপের-কুল সব কুল খেয়েছে, হতভাগী না তো কি! দু'বছরে বাপ গেল আর চার বছরে মা। কোলে পিঠে করে আমিই মানুষ করে তেরো বছরে বিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। আমার কপাল ভাঙার পর এই বারো বছর তো আর সেখানে পা দিইনি। গিয়ে শুনলাম হতভাগী বিয়ের এক বছর পেরুতে না পেরুতে শাঁখা সিঁদুর খুইয়ে এসেছে।"

হতভাগী কমল দিদির কাছেই থাকে। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই রবির মন এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আপনাকে সে সহস্রবার ধিক্কার দেয়, নিজের মনকে কলুষিত বলে সে অত্যন্ত ঘৃণা করে। কিন্তু তবু সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, এই অপরিচিতা মেয়েটিকে হয়তো বেশি দিন সে নির্বিকারভাবে মন থেকে দূরে ঠেলে রাখতে পারবে না। কমলকে পঁচিশ বছরের যুবতী নারী হিসাবে দেখবার একটা প্রবল প্রবণতা যে তার মনের আছে, এ কথা সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না।

দিদির ওপর রাগ হয়। মনে হয় দিদি বুঝি অতি সহজে লতাকে ভুলে গেছেন বা ভুলতে চান। অযাচিতভাবে এই বোঝা তার স্কন্ধে চাপানোর জন্যে সে সকলের ওপরই বিরক্ত হয়ে ওঠে। প্রতিদিন যত তার মনে হয় যে কমল বোধহয় লতার চেয়েও পরিপাটীভাবে সকল কাজ করে, সংসারের নানা খুঁটিনাটিতে যত সে কমলের অক্লান্ত পটু হাতের পরিচয় পায়, অকারণ বিদ্বেষ তার তত বেড়ে ওঠে।

কমলকে সুন্দরী বলা হয়তো চলে না, কিন্তু তার মুখে একটি উগ্র শ্রী আছে, এবং তার কৃশ দেহে মনে হয় যৌবন ভরা নদীর মতো পরিপূর্ণ হতে না পেরে সঙ্কীর্ণ তীরের মাঝে বেগে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

লজ্জা কমলের নেই, কিন্তু তাকে বেহায়া বলাও চলে না। সেই প্রথম দিনের পর থেকে মুখের কাপড় সে খুলেই রাখে। অসঙ্কোচে সে চলা-

ফেরা করে বটে, কিন্তু গায়ে পড়ে আলাপ করবার কোনো চেষ্টা তার মাঝে রবি দেখতে পায় না। কিন্তু তবু রবির অসহ্য মনে হয়। লতার নির্দিষ্ট কাজে আর একজনকে ব্যস্ত থাকতে দেখে তার মন আরও পীড়িত হয়ে ওঠে। তার মনে হয় লতার অভাবে সংসারের পঙ্গু ছন্দকে ঠেকা দিয়ে সহজভাবে চালাতে গিয়ে সে যেন সমস্ত বিস্বাদ করে তুলেছে।

রবির বিরক্তি ক্রমশ ভয়ে পরিণত হল। এখনো সে অপিস থেকে অনেক রাত্রে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরে। উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে এখনো সে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু একদিন হঠাৎ এইটুকু আবিষ্কার করে সে ভীত হয়ে ওঠে যে, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোবার ভেতরে তার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য প্রবেশ করেছে। আজকাল তাকে বাড়ি ফিরব না এই সংকল্প বার বার স্মরণ করতে হয়। এতদিন সে নিজের অজ্ঞাতে ঘুরে বেড়িয়েছে, আজকাল তাকে সচেতনভাবে কর্তব্য সাধনের মতো বাড়ি ফেরার ইচ্ছাকে দমন করতে হয়।

রাত্রে দিদির বদলে কমল এসে দরজা খুলে দেয়। খাবারের আয়োজন করে ডাকে, "আসুন।" কথাবার্তা কিছু হয় না। নীরবে রবি খেয়ে উঠে শুতে চলে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত সে টের পায় কমল সংসারের কাজ করছে। সংসারের সকল কাজ সে-ই করে। কেমন ধীরে ধীরে যে কখন সংসারের সকল ভার এই মেয়েটি নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছে, কেউ বলতে পারে না। তাদের যা-কিছু কথা হয় এই সংসারের সূত্রে। এবং সেই সামান্য কথাবার্তার সুর কেমন ধীরে ধীরে বদলায় তা রবি বুঝতে পারে না, এমন নয়।

বাজারের পয়সা দিয়ে কমল বলে, "একটু চোখ দিয়ে দেখে বাজার করবেন, বুঝেছেন? কালকের বেগুনগুলো তো সব পোকা-ধরা ছিল।"

রবি বলে, "চোখ দিয়েই তো দেখি, তবে বেগুনের ভেতরকার পোকা দেখতে গেলে তো দিব্যদৃষ্টির দরকার—সে আর কোথায় পাব?"

কমল একটু হাসে, বলে, "শুধু চোখেই লোকে পোকা-ধরা বেগুন চেনে, দিব্যদৃষ্টির দরকার হয় না।"

"আমি তাহলে চোখেও বোধহয় কম দেখি।" বলে রবি নিজের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে যায়। এই সামান্য হাস্য-পরিহাসের চেষ্টা-টুকু তাকে যেন হঠাৎ চাবুক মেরে সচেতন করে দেয়।

কিন্তু একেবারে গম্ভীর হয়ে থাকাও বোধহয় যায় না। রবির মনে হয়, তা উচিতও বুঝি নয়। মনে হয় এই অনাত্মীয় মেয়েটি তার সংসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, দুবেলা দুমুঠি খেতে দেওযাই কি তার যথেষ্ট প্রতিদান? তার নিজের মনের অন্যায প্রবণতার জন্যে কি তার প্রতি অকারণে বিরূপ হয়ে তাকে অপমান কবতে হবে! সামান্য একটু মিষ্টি ব্যবহারও কি তার প্রাপ্য নয়?

এমনি করেই ব্যাপার এগোয়। কে যে কোন দিন কোন দিক থেকে ব্যবধান একটু করে সরায তা রবি ভালো করে বোঝে না, কিন্তু আলাপ তাদের টুকরো-টুকরো কথা থেকে ক্রমশ দীর্ঘ হযে আসে, হাস্য-পরিহাসের সুর আরও স্পষ্ট হয়।

হঠাৎ একদিন বিছানা পাততে পাততে কমল জিগগেস করে, "চোখের বালি পড়েছেন?"

রবি টেবিলে বসে পড়তে পড়তে অন্যমনস্কভাবে বলে, "হুঁ!"

কিন্তু পর মুহূর্তে সে সচেতন হয়ে ওঠে! মুখ ফিরিয়ে দেখে কমল তার দিকে তখনো তাকিযে আছে। দৃষ্টি নয়—সে যেন ক্ষুধিত আলিঙ্গন! রবি কমলকে যেন নূতনভাবে অনুভব করে। মনে হয, কমলের বক্র হাসির মধ্যে বুঝি একটু কঠিনতার আভাস খেলে যায়। কিন্তু সে কঠিনতা শুধু রবির দিক থেকে আঘাত পাবার আশঙ্কার ছদ্মবেশ। রবি আবার বইয়ের দিকে চোখ ফেরায়, কিন্তু পড়তে পাবে

না। কমলের দৃষ্টি তার সমস্ত দেহের মধ্যে অসহ্য আনন্দের মতো উন্মত্তভাবে সঞ্চরণ করে ফেরে, সর্বাঙ্গের সমস্ত স্নায়ুতে সে দৃষ্টির আলিঙ্গনে অশান্ত শিহরণ জাগে।

তারপর লতার স্মৃতির সম্মানার্থে একবার রবি শেষবাবের মতো বিদ্রোহ করল। কিছুদিন থেকে আবার সে আগেকার মতো জীবনেব নিয়মিত ধারায় ফিরে এসেছিল, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। আপিস থেকে আবাব সে গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরে, কোনো দিন এমন কি আপিসে পর্যন্ত যায় না। কমলের সঙ্গে সে একেবারে কথা বন্ধ কবে দেয এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলে। অবশ্য এড়াবার জন্যে বিশেষ চেষ্টাও তাকে করতে হয় না। কমল নিজেকেই একেবারে সরিয়ে নেয়। বাজাবের পয়সা সে টেবিলের ওপর রেখে কাগজে বাজারের ফর্দও সেই সঙ্গে রেখে দেয়। খাবাবের আয়োজন করে দিযে সে সরে যায। কিন্তু অকারণে কমলের এই ব্যবহারেও ববির রাগ হয! কমলকে এড়াবাব কোনো অসুবিধা না থাকায় তাকে অপমান কববাব অহেতুক ইচ্ছা তাব মনে জাগে।

আলমারিতে অনেকগুলি পুতুল সাজানো ছিল। সে পুতুল পুরুষানুক্রমে সেখানে সংগৃহীত হয়েছে এবং সেই পুতুল দেখিযেই একদিন শৈশবে মা বলতেন, "তোব বৌ এসে খেলা কববে।" কমল আলমাবি খুলে পুতুলগুলি নূতন কবে ধুলো ঝেড়ে সাজিযে রাখছিল। ববি ঘরে ঢুকে কমলকে দেখেই বেরিযে যাচ্ছিল, কিন্তু দবজাব কাছে যেতে অপমান কববার একটা ছুতো তাব মনে পড়ে গেল, ফিরে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বললে, "ওগুলো নাড়া-চাড়া আমি পছন্দ কবি না, এতে তাব অপমান হয়!"

উত্তর হয়তো এ কথার ছিল। দিদি নিজে কমলকে সেগুলি সাজাতে

বলেছিলেন, এবং যত্ন করে গুছিয়ে রাখলে 'তার' কি করে অপমান হয় তাও বিচারের কথা। কিন্তু উত্তর দিতে কমল পারে না; অপমানই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে উত্তরের কোনো মূল্যই নেই এটুকু কমল বোঝে। নীরবে সে পুতুল সাজানো থামিয়ে আলমারি বন্ধ করে দিলে, শুধু তার সমস্ত মুখ এই নির্মম আঘাতে করুণ, পাংশু হয়ে উঠল। কমল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু তার সেই পাংশু কাতর মুখের অসহায় বেদনা রবির বুকে তীরের মতো বিঁধল।

এর পর কি হবে, এবং কি করা উচিত রবি কিছুই বুঝতে পারে না। কমলের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় এই কদিনে সে যেন অত্যন্ত কাহিল হয়ে গেছে। একটি গাঢ় অবসন্ন বেদনার ছায়া তার মুখে লেগে থাকে। রবির মন আর্দ্র হয়ে আসে। সে মনে করে এ শুধু করুণায়। কিন্তু কি ভাবে সেদিনের রূঢ় আচরণের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করলে তা করুণার সীমা ছাড়িয়ে যাবে না, তা সে ঠিক করতে পারে না। কিন্তু তাকে দ্বিধায় বেশি দিন থাকতে হয় না।

সেদিন সন্ধ্যায় রবি ইচ্ছা করেই ঘরে ছিল। আলো দিতে এসে কমল খপ করে রবির হাতটা ধরে ফেললে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রবি একেবারে বিস্মিত হয়ে গেল। কমলের চোখে জল! রবির হাত নিজের হাতের মুঠিতে ব্যাকুলভাবে চেপে ধরে সে ধরা গলায় বললে, "আমাকে ক্ষমা করুন।" সে কণ্ঠস্বরে সীমাহীন ব্যাকুলতা।

"ও কি করছ, কমল!"

কিন্তু কমল হাত ছাড়ল না। সেই কোমল উষ্ণ হাতের স্পর্শ তীব্র সহানুভূতির স্রোতে রবির সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল, বেদনার চেয়ে সে আনন্দ যেন তীক্ষ্ণ।

কমল তেমনি বলে যাচ্ছিল, "আমি সত্যিই নির্লজ্জ, আমি মনে মনে

সত্যিই পাপী, আমি আবার দেশে চলে যাচ্ছি. কিন্তু আমায় ক্ষমা করলেন বলুন!"

রবি ব্যাকুল ও শঙ্কিত হয়ে বললে, "ও কি করছ! দিদি পাশের ঘরে রয়েছেন, শুনতে পাবেন যে!"

কিন্তু কমলের অশ্রু থামতে চায় না, বললে, "আমি সত্যিই এবার দেশে যাব, আপনি শুধু ক্ষমা করলেই আমি অনেকটা শান্তিতে যেতে পারব।"

যা-কিছু অস্পষ্ট স্মৃতি, শিথিল সঙ্কল্প রবির মনে ছিল, এই অশ্রুর প্লাবনে সে সমস্ত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। অকস্মাৎ ব্যগ্র বাহুতে কমলকে বুকে টেনে নিয়ে সে বললে, "তোমায় কোথাও যে যেতে দিতে আমি পারব না, কমল!"

সেই পুরাতন মামুলি নাটুকেপনা! কিন্তু তারা সে কথা বুঝতে পাবে না। আর মানুষের প্রবলতম অনুভূতির প্রকাশ বুঝি অমনি স্বাভাবিকতার সীমা ছাপিয়েই যায়!

শুধু দিদি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কমলের হাতে সংসার ছেড়ে দিয়ে তিনি যে পূজা-ধর্মের নিভৃতলোকে আপনাকে একেবারে নিমগ্ন কবতে চেয়েছিলেন, সেখানেও এই সংসারের ধারা পরিবর্তনের সংবাদ পেঁছায়।

কমল যেন একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তার এ নূতন রূপে রবি পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে যায়। পিপাসিত শুষ্ক মরুর গাছ বহুদিন পরে পর্যাপ্ত জল পেলে বুঝি এমনিই হয়। শুধু তার রূপে নয়, তার দেহের প্রতি ভঙ্গিতে গতিতে এই নূতন সজীবতার প্রকাশ উচ্ছল হয়ে ওঠে। কোনো বিধিনিষেধ সে মানতে চায় না এমন নয, কোনো বিধি তার মনেই পড়ে না।

রবিকে ভাত দিতে দিতে সে সামান্য কারণে খিলখিল করে হেসে ওঠে। দিদি ঘর থেকে তিক্ত তীব্র কণ্ঠে বলেন, "ওকি বেহায়াপনা হচ্ছে, কমল ?"

রবি লজ্জায় ঘৃণায় এতটুকু হয়ে যায়, কিন্তু কমলের মুখে তার কোনো আভাসই দেখা যায় না। রবির হাতে একটা চিমটি কেটে সে হাসি থামাবার জন্যে নিজের মুখে কাপড় গুঁজে দেয়।

রবির দিক থেকে অনুরাগের প্রতিদান পাবার পরের দিন থেকে সে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। তার সমস্ত আচরণে কথায় হাসিতে আনন্দের এমন একটি আতিশয্য প্রকাশ পায় যে, রবি বিস্মিত হয়ে লতার সঙ্গে তার তুলনা না করে পারে না। লতার সমস্ত আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে কোথায় একটি সংযম ছিল। সে যেন ছিল শান্ত কোনো নদীটির মতো, কিন্তু কমল যেন উচ্ছৃঙ্খল ঝরনা, যেমন খেয়ালী তেমনি উদ্দাম !

তাদের দুজনের এই সম্বন্ধের মধ্যে যে হীন গোপনতা আছে তা অনবরত রবিকে পীড়িত করে। বাইরের লোকের কাছে এই সম্বন্ধ যে কতদূর গর্হিত ও লজ্জাকর, সেই উপলব্ধি তার পরম আনন্দের মুহূর্তগুলিকেও গ্লানিতে বিষাক্ত করে দেয়। কিন্তু কমল যেন কিছুই বুঝতে পারে না। যখন তখন সামান্য সুবিধা পেলেই সে আদরের আতিশয্যে রবিকে অস্থির করে দেয়। তার পঁচিশ বৎসর বয়সের আড়াল থেকে বঞ্চিতা তার পনেরো বৎসরের বালিকা-জীবনটিও যেন এ আনন্দের সমস্ত স্বাদ গ্রহণ করতে চায়। বালিকার মতো সে অশান্ত উদ্দাম হয়ে ওঠে।

আপিস যাবার সময়। রবি তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে চুল আঁচড়ায়। হঠাৎ জল দেবার ছুতোয় ঘরে ঢুকে গলা ধরে ঝুলে পড়ে কমল বলে,

"আচ্ছা, দেখব কেমন জোর—কতক্ষণ থাকতে পার?" এই মধুর ভার ঘাড় থেকে নামাবার দুর্বল চেষ্টা করে রবি বলে, "ছাড়, ছাড়, বেলা হয়ে গেছে।"

পা দুটি কুঁচকে ঝুলোতে ঝুলোতে কমল বলে, "ছাড়ব না, আমায় আপিসে নিয়ে চল।"—হাসিতে তার মুখ চোখ অপূর্ব হয়ে ওঠে।

রবি কৃত্রিম রাগের স্বরে বলে, "যাও, ন্যাকামি কোরো না।"

অত্যন্ত আবদারের ভান করে কমল বলে, "ন্যাকামি যে ভালো লাগে।"

দুজনেই হেসে ওঠে, কিন্তু কমলের হাসি একেবারে অবাধ সঙ্কোচহীন।

"কিন্তু এ সব কি ইতুরে কাণ্ড শুনি, এটা গেরস্ত বাড়ি, না কি?"

বজ্রাহতের মতো চমকে ফিরে রবি দেখে দিদি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর মুখ রাগে আরক্ত হয়ে উঠেছে। সে আর দাঁড়ায় না। এই পরম লজ্জাকর অবস্থা থেকে কোনো মতে পালিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। কমল একা এই সমস্ত অপরাধের শাস্তি কি ভাবে গ্রহণ করবে সে কথা ভাববারই অবসর পায় না। কিন্তু আপিস থেকে ফিরবার সময় তার পা আর বাড়ির দিকে উঠতে চায় না। অনেক রাত্রে অবশেষে মরিয়া হয়েই সে বাড়িতে ঢোকে। কমলের অবস্থা ভেবেই সে আরও শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এই নিদারুণ অপমানে, এই গ্লানিতে শেষে সে যদি ভয়ঙ্কর কিছু করে বসে!

দিদি এসে দরজা খুলে দেন। কোনো দিকে কমলকে দেখা যায় না। অথচ জিগগেস করবার কোনো উপায়ই নেই। আজকের সব কাজ দিদি নিজেই করেন। নতমুখে কোনো মতে আহার সেরে রবি যখন নিজের ঘরে যায়, তখন তার মন একেবারে ভেঙে পড়েছে।

কিন্তু টেবিলের ওপরই চিঠিটি মেলা। কমল পেনসিলে দ্রুত হাতে লিখে গেছে, "ঘুমিও না রাত্রে, উত্তরের জানলায় শব্দ করলে বেরিয়ে এস।"

রাত্রে সেদিন অনেক কথাই হয়। কমল রবির বুকে মুখ গুঁজে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ওঠে। বলে, "বল তুমি আমায় কিছুতেই ছেড়ে দেবে না!"

এই ব্যাকুল মিনতি, ভীরু পাখির মতো বক্ষনিবদ্ধ এই কোমল উষ্ণ নারীদেহ—সমস্ত মিলে রবির মনে যেন অভূতপূর্ব তীব্র নেশা ধরিয়ে দেয়। সে একটা প্রকাণ্ড শপথ করে বসে।

কমল আবার বলে, "সেদিন তোমাকে ছেড়ে কি বলে দেশে যেতে চেয়েছিলাম ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই!" খানিক থেমে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে, "কিন্তু কেন এমন হল? যদি এখানে না আসতাম।"

রাত্রির অন্ধকারে তারকালোকের স্নিগ্ধ মাদকতায় বুঝি অনেক কথাই বলা চলে, দিনের বেলা সূর্যের প্রখর আলোকে সে কথা হয়তো নিজের বর্ণবাহুল্যে লজ্জিত হয়। কোন পৃথিবী যে সত্য, তাই বা কে জানে—রাত্রির না দিনের!

তাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য স্থিরও হয়ে যায়। সে কর্তব্য অসাধারণ। কিন্তু কমলের স্পন্দিত বক্ষের ধ্বনি নিজের সর্বাঙ্গে অনুভব করতে করতে রবির সে কথা মনে হয় না।

কমল বলে, "তুমি এবার বিয়ে করতে রাজী না হলে দিদি নিশ্চয়ই আমায় নিয়ে তীর্থবাস করবার কথা বলবেন, দেখ। আজ সারাদিন আমায় সেই কথা বলেছেন আর বকেছেন।" তারপর একটু থেমে চোখের জল আঁচলে মুছে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, "কিন্তু তুমি শেষকালে পেছিয়ে যাবে না তো? ভাববে হয়তো থাক গে, আপদ তীর্থেই বিদায় হোক, কেমন!" উত্তরে রবি আরও একটু নিবিড়-ভাবে তাকে বুকে চেপে ধরে মাত্র।

কমল আবার বলে, "আচ্ছা, আমরা যেতে যেতে লুকিয়ে নেবে গেলে দিদি একলা রেলে যেতে পারবেন তো অত দূর, ভয় নেই তো কিছু?"

"সে বন্দোবস্ত আমি করব'খন, তোমায় ভাবতে হবে না।"

পরের দিন সকালে অতৃপ্ত ঘুমের চোখে উঠে রবির সত্যিই সব স্বপ্ন বলে মনে হয়। দিদি সকালেই কথাটা পাড়লেন। ঘরে ঢুকে একেবারে কোনো প্রকার ভূমিকা না করে বললেন, "আমি সম্বন্ধ করেছি, তোকে এবার বিয়ে করতে হবে।"

রবি চুপ করে রইল।

দিদি বললেন, "চুপ করে থাকলে চলবে না, এই মাসটা পেরুলেই আমি বৌ আনব। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো, তুই না হয় নিজেই একবার দেখে আসিস।"

এ লজ্জা রাখবার জায়গা নেই। কালকের ব্যাপারের সঙ্গে এই বিবাহের প্রস্তাবের সম্বন্ধের জন্যেই এ প্রস্তাব তার কাছে আরও অসহ্য বলে মনে হয়।

"আমি বিয়ে করব না!"

দিদি এবার আগুন হয়ে বললেন, "তবে যা খুশি কর, আমি এ সংসারে আর থাকব না, আমাদের কাশী রেখে এস।"

রবি চুপ করে রইল।

দিদি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "আমি আর একদিনও কিন্তু থাকব না, আমাদের কাশী রেখে এস।"

কর্তব্য, সঙ্কল্প সমস্তই স্থির। দিদিকে পাঠিয়ে সে কমলকে নিয়ে অন্য কোথাও থাকবে। কাশীতে একজন আত্মীয় তাদের থাকেন, আগে থাকতে তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিদি যাচ্ছেন জানিয়ে রবি সঙ্কল্প করেছিল মাঝ-পথে কোনো ছুতোয় কমলকে নিয়ে নেবে যাবে। তারপর নূতন সংসার, কমলকে নিয়ে নূতন জীবন! নামবার ছুতোটা অবশ্য যে কি হবে তা সে এখনো স্থির করেনি এবং কমলের সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনটা কোথায় কি ভাবে আরম্ভ হবে তাও অবশ্য সে রাত্রে সে ভালো করে ভেবে দেখেনি, তবে মোটামুটি ভবিষ্যৎ জীবনের খসড়া

তার ঠিকই ছিল। কিন্তু আগের রাত্রের অনিদ্রায় ও সারাদিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত মাথাধরা অবস্থায় আপিস থেকে বেরিয়ে সমস্ত সংকল্প তার অত্যন্ত আজগুবি বলে মনে হল।

তার গৃহ তার নীড়, সে নীড়ের পুরাতন নিত্য মধুর ছন্দ, সে নীড়ের সহস্র স্মৃতি, এই সবের সঙ্গে তার জীবন একান্তভাবে জড়িত। তার মনের সমস্ত নিরাপদ নোঙর উপড়ে কে যেন তাকে উন্মত্ত সাগরের দুর্যোগের মধ্যে ঠেলে দিতে চায়। সেখানে সুখ শান্তি আনন্দকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে জয় করে রাখতে হয়, কিন্তু সে শক্তি ও সাহস তার কোনো কালে ছিল না। আর আনন্দের তীব্রতাও যেন তার সহ্য হয় না।

লতাকেও সে ভালোবেসে ছিল, কিন্তু সে ভালোবাসা এমন উগ্র নয়, নীড়ের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার সঙ্গে সে ভালোবাসা অনায়াসে মিশে গেছে। কিন্তু রবির মনে হয় কমলের ভালোবাসাও যেন কোন-দিন সে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। সে ভালোবাসা উগ্র প্রচণ্ড বন্যার মতো, সে ভালোবাসা সংসারের ছন্দে আপনাকে মিলিয়ে দেয় না, জীবনের একটু মধুর ব্যাখ্যাকে বাঁচিয়ে চলে না, সে ভালোবাসা মানুষের সব কিছু দাবি করে—সর্বগ্রাসী দুরন্ত সে প্রেম। এই আতি-শয্যটি রবির সংস্কারেব বিরোধী। কমলের প্রতি আচরণে, তার আদরে তার সোহাগে এই আতিশয্য, এই উচ্ছৃঙ্খলতা রবিকে বরাবর উদভ্রান্ত করে দিয়েছে। কমলের আনন্দ বেদনার মতো তীব্র। সেই প্রেমকে সম্বল করে নোঙর ছিঁড়ে জীবনের দুর্যোগের মাঝে নিরাশ্রয় হয়ে বেরিয়ে পড়তে হঠাৎ রবি ভয়ে শিউরে ওঠে। তার জীবনের সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সংস্কার, সমস্ত কল্পনা এর বিরোধী। লতার স্মৃতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাব কথা তার মনে ওঠে না, কিন্তু এ যে একেবারে জীবনকে গ্রহণ করবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত পরিবর্তন।

কমলের সঙ্গে আর যাই হোক, নীড় রচনা করা যে যাবে না এ কথা

রবি বোঝে। আত্মীয়-স্বজনকে এড়িয়ে অত্যন্ত লজ্জাকর গোপনতার মাঝে এই যে গৃহ তারা পাতবে, সে গৃহ কিছুতেই নীড় হয়ে উঠতে পারে না। তার নিজের বর্তমান গৃহ শুধু তো ইট কাঠ পাথরের নয়, তার পেছনে কত স্মৃতি, তার কতদিনের অভ্যাস এবং তার চেয়েও বেশি—পৃথিবীকে আঙিনা করার সে একটি বিশেষ ছন্দ! কমলের সঙ্গে জড়িত জীবনে নোঙর ছেঁড়ার দুঃসাহসিকতার মাঝে দুর্লভ আনন্দ হয়তো আছে, কিন্তু দুর্লভ আনন্দের প্রতি কোনো লোভ তার নেই, এবং দুঃসাহস আর যার থাক তার নেই। জীবনের পুরাতন ধারাটি ফিরে পাবার জন্যে তার সমস্ত প্রাণ লালায়িত হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে, লতাকে সে ভালোবাসেনি, কমলকে সে ভালোবাসে না, সে ভালোবাসে শুধু তার কৈশোর স্বপ্নের সেই রাঙাবৌকে। সে রাঙাবৌ একান্ত অন্তরঙ্গ, অতি-পরিচিত একটি সুরের অন্তর-লক্ষ্মী। তাকে পরিত্যাগ করে লক্ষ্মী-ছাড়া হবার সাহস, শক্তি বা ইচ্ছা কিছুই তাব নেই।

রাত্রে বাড়ি ফিরে অসুখের ছুতোয় কিছু না খেয়েই রবি শুয়ে পড়ল। বালিশের তলায় কমলের চিঠিতে লেখা ছিল, "আজ আবার তেমনি এস, লক্ষ্মীটি, ঘুমিয়ে পড় না, ও জানলার কাছে নইলে দাঁড়িয়ে ডাকতে আমার বড় ভয় করে।"

কিন্তু রবি সেদিন উঠল না। ভীত কমল বুকের দুরন্ত স্পন্দন নিয়ে ব্যাকুলভাবে বারবার সে জানলায় উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পরম হাতাশা নিয়ে ফিরে গেল তা সে জানতেও পারলে না। সে তখন নিজের সঙ্কল্প স্থির করে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে দিদি ঘরে ঢুকে গম্ভীর মুখে বললেন, "আজ আর আপিস যেয়ো না তাহলে, আমি যাবই মনে থাকে যেন!"

রবি বিছানার ওপর উঠে বসে মুখে হাসি টেনে বললে, "না, তোমায় যেতে হবে না।"

"তার মানে?"

"তার মানে তুমি যা খুশি কোরো, আমার আপত্তি নেই," বলে রবি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কমল তখন যাবার উদ্যোগে বাক্স-পেটরা গুছোতে গুছোতে একটি ছোট্ট বহু-পুরাতন লুকানো আর্শিতে নিজের মুখ দেখছিল।

সেদিন অবশ্য গন্তব্য স্থানে আমরা পেঁৗছে ছিলাম। এবং দশম শতাব্দীর স্থাপত্যের বদলে পঞ্চাশ বছর আগের একটি ভগ্ন নিকৃষ্ট ধরনের বিষ্ণুমূর্তি দেখে দীনেশ অত্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরেছিল। অনন্তবাবু শুধু বলেছিলেন, "এ ঠিক হয়েছে। প্রেমের পথটিই শুধু মধুর, কিন্তু পথের শেষ বোধহয় সব জায়গাতেই এমনি স্বপ্নভঙ্গের হতাশা। পথই আমাদের ভালো।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ববীন্দ্রনাথেব পব বাংলা গল্পেব দিগন্তকে যাঁবা আবো প্রসাবিত কবেন তাঁদেব মধ্যে প্রথমেই নাম কবতে হয শৈলজানন্দেব আব প্রেমেন্দ্র মিত্রেব, শৈলজা-নন্দের এক অর্থে, প্রেমেন্দ্র মিত্রেব অন্যতব অর্থে। দীন অভাজনদেব নিযে গল্প লেখা শুবু কবে প্রেমেন্দ্র মিত্র ক্রমে নিজেব মনোযোগ ব্যাপ্ত কবে দিলেন জীবনেব বহুল বৈচিত্র্যে। শুধু বিষযবস্তুতে যে তিনি অভিনবত্ব আনলেন তাই নয, পবিবেশসৃষ্টিব কুশলতায, বাকভঙ্গীব উল্লেখযোগ্য সংযমে, অতিলৌকিকতাব আভাসে ইঙ্গিতে, বহস্যেব আবহ বচনায এমন শক্তিব পবিচয দিলেন যে কাবও আব স্বীকাব কবতে বাধা বইল না যে ববীন্দ্রনাথেব পবও বাংলা ছোটগল্প অনেক শক্তিমান হযেছে, নতুন স্বাদ এসেছে তাতে। অস্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি ও ঘটনাসংস্থানেব ওপব গল্প বচনায প্রেমেন্দ্র মিত্রেব মতো কৃতিত্ব খুব কম লেখকই দাবি কবতে পাবেন। আব এই কৃতিত্ব অর্জন কবা কত যে দুঃসাধ্য তা যে কোনো দেশেব সাহিত্য পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হবে।

অন্যপক্ষে, কাব্যকলাব ক্ষেত্রে বিশ্বাসেব সুদৃঢ় ঘোষণায প্রেমেন্দ্র মিত্র নজবুলেব অনুগামী, যা একবাব বিশ্বাস কবেছেন তা স্পষ্ট কবে বলতে কখনো দ্বিধা কবেননি

> আমি কবি যত কামাবেব আব কাঁসাবিব আব ছুতোবেব, মুটে মজুবেব,
> —আমি কবি যত ইতবেব।

পববর্তীকালেব সমাজসচেতন কবিতাব ক্রেডো প্রথম প্রেমেন্দ্র মিত্রই ঘোষণা কবলেন। শুধু কবিতাব নয, গল্পেব, উপন্যাসেবও। সর্বত্রই প্রাণ প্রজ্বলন্ত শক্তিব স্বাক্ষব। অন্যান্য লেখকেব তুলনায প্রেমেন্দ্র মিত্রেব বলাব কথা বেশি, অথচ সকলেব চেযে কম কথায তিনি তাঁব বক্তব্য সাবেন। বিবৃতিব চেযে ইঙ্গিতেই তাঁব বেশি আসক্তি, ব্যক্ত বস্তুব চেযে অনুক্তেব আবেদনই প্রবলতব। তিনি জানেন পাঠককে দিযে কতখানি কল্পনা কবিযে নেযা যায, অনেক সম্ভাবনাব মধ্যে শিল্পপবিণতিটিকে আবিষ্কাব কবাব কত বেশি আনন্দ দেযা যেতে পাবে।

কল্লোলযুগেব জীবনসন্ধিৎসা প্রেমেন্দ্র মিত্রেব বচনায প্রতিফলিত। আপাতিক সত্যে সন্তুষ্ট না হযে শাশ্বতেব সন্ধান তিনি অসাধাবণ নিষ্ঠাব সঙ্গে কবেছিলেন। জীবনেব যে বূপ তাঁব চোখে পড়ে তা সব সময মনোহাবী নয, তাই বলে বমণীযতাব অতিবিক্ত আচ্ছাদনে সুশোভিত কবে প্রেমেন্দ্র

মিত্র তাকে পবিবেশন করতে যাননি। বাস্তব বর্ণনায প্রেমেন্দ্র মিত্র কখনো কখনো গোগোলেব মতো নিষ্ঠুব, জীবনেব অন্তিম সার্থকতা বিচাবে নিষ্কবুণ শুভাবিন্বেষী। প্রত্যক্ষবূপে আধুনিক সমাজেব শিল্পী বলে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রকৃতিকে ছেড়ে নগবকেই পটভূমি বানিযেছেন, যে নগব মানুষ সৃষ্টি কবেছে, অথচ যে নগব মানুষকেই গ্রাস কবতে উদ্যত। পল্লীজীবনেব সহজ মসৃণতা ছেড়ে নগবেব আবর্ত বুঝি বড বেশি কুটিল মনে হল মানুষেব। নতুন দুঃখ এল, জীবনে অভিনব বৈষম্য দেখা দিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রেব বচনায তাবই খতিযান।

স্বভাবতই বহির্মুখী ও প্রখববূপে ঘটনাসচেতন লেখক বলে প্রেমেন্দ্র মিত্রেব বচনায একঘেযেমিব ক্লান্তি স্পর্শ কবেনি। বাংলা গল্প এবং কবিতাব ক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাথেব পব প্রেমেন্দ্র মিত্র নিশ্চযই এক নতুন অধ্যায।



....

কুয়াশা ॥ উপন্যাস ॥ জীবনেব যে অংশ মলিন বিকৃত, তাকে বিস্মৃতিব কুযাশায ঢেকে বেখে হতে পাবে না কি নবজীবনেব সূর্যোদয? যে পাপী দীর্ঘ দুঃখেব দহনে প্রাযশ্চিত্ত না-কবে, তাব কি পবিত্র হবাব অধিকাব নেই? তাব পাপেব কাছে প্রেম থাকবে বঞ্চিত হযে, সেই দুঃখ কি তাব কৃচ্ছ্রসাধনাব চেযে কম ক্লেশকব? জীবনেব একটি গভীব জিজ্ঞাসাব দুর্লভ অনুভূতি। বাচ্যার্থেব থেকে গূঢার্থেব দিকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রেব সংকেত, এইখানে সেই সংকেত আবো বেশি প্রখব হযেছে হৃদযেব আবেদনে। দাম ২॥০

....